KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন, (SAMAKALIN)	Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৬/- ৬/- ৬/- ৬/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৬৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ আষাঢ়, ১৩৬৫ শ্রাবণ, ১৩৬৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্র
কার্যালয়ে পাওয়া যাইতেছে।

৮, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

বই-এর নাম লেখক

১। রাশি ও লগ্ন বিজ্ঞান রহস্য—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
২। হাতের রেখায় জীবন রহস্য—ডঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড
৩। Expression & Language of the Unconscious—Sri Sabyasachi
৪। নতুন দৃষ্টিকোণে গ্রহ নক্ষত্র ও সাব—শ্রীসব্যসাচী
৫। নাড়ী জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ রহস্য—শ্রীবিষ্ণুদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রী
৬। জ্যোতিষী শিক্ষা—শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মা (১ম,২য়,৩য়,৪র্থ,৫ম খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১০·০০, ৩য়
৭। Jyotish Sanchayan
৮। Questions in Jyotisnatak Examination (1975-85) and Hints to Answer—Viswanath Deva Sarma
৯। বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ—শ্রীউৎপল চক্রবর্তী
১০। Table of Ascendants & Ephemeris—By N. C. Lahiri
১১। লঘুজাতকম্—অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য
১২। বৃহৎজাতকম্—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৩। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ—১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড
ঐ ৩য় খণ্ড
১৪। গ্রহের দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল ডাঃ রণতোষ সাহা
১৫। ফলদীপিকা—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৬। ভারতীয় সাহিত্যে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ—ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়
১৭। জ্যোতিষতত্ত্ব সংকেত ও বিশ্লেষণ—শ্রীমলয় রায়
১৮। মিথ্যা নয়, সত্য—প্রীতি রায়
১৯। গ্রহের ভাবপতির দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল—ডাঃ রণতোষ সাহা

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৯/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

ষষ্ঠ বর্ষ বৈশাখ ১৩৬৫

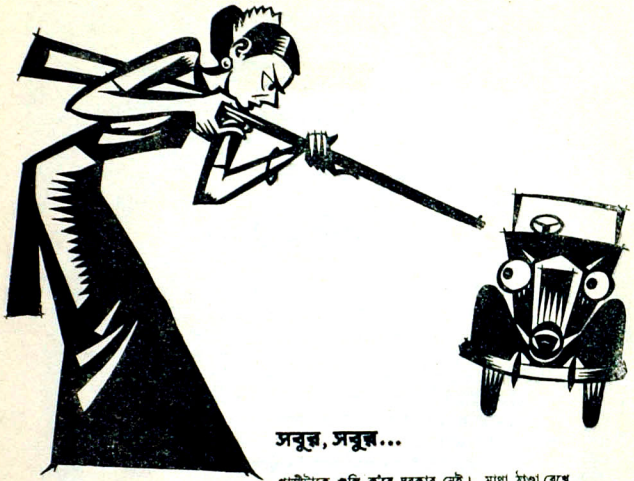

সবুর, সবুর...

গাড়ীটাকে গুলি ক'রে দরকার নেই। মাথা ঠাণ্ডা রেখে উড়ন্ত লাল ঘোড়া মার্কা পেট্রল পাম্পে গাড়ী চালিয়ে যান ··· আর তারপর

মবিলগ্যাস দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে চলুন!

মবিলগ্যাস স্ট্যানভ্যাক্-এর তৈরী

স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী (সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

Mobilgas

V 6444

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ : বৈশাখ ১৩৬৫

॥ সূচীপত্র ॥

প্র ব ন্ধ ॥ পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ২৫

'সাধনা' পর্বের রবীন্দ্রনাথ। হরপ্রসাদ মিত্র ৩০

মুক্তধারা। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৩৩

ব্রহ্মসভা না ব্রাহ্মসমাজ। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৭

আজি মম জন্মদিন। সোমেন বসু ৫৬

অ নু স্মৃ তি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৭১

গ ল্প ॥ পরবাসী। মানসী দাশগুপ্ত ৭৪

আ লো চ না ॥ সংস্কৃতি প্রসঙ্গে রাখাল ভট্টাচার্য ৮৩

শেষের কবিতায় প্রেম। মীরা দত্ত ৮১

স মা জ স ম স্যা ॥ পরাভূত রবীন্দ্রনাথ। সুব্রতেশ ঘোষ ৮৮

সং স্কৃ তি প্র স ঙ্গ ॥ বালুচর শাড়ি। কল্যাণ দাশগুপ্ত ৯২

স মা লো চ না ॥ গীতিগুচ্ছ। রথীন্দ্রনাথ রায় ৯৪

সম্পাদক

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

আপনার লাবণ্য

আপনার কাছে চিত্রতারকার লাবণ্যের মতই প্রিয়!

চিত্রতারকাদের ত্বক সর্বদাই মসৃণ ও সুন্দর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আপনার নিজের ত্বকেরও যত্ন নেওয়া দরকার। সুন্দরী চিত্রতারকা নিরুপা রায় কি বলেন শুনুন—"সৌন্দর্যের জন্যে লাক্স টয়লেট সাবান আমার কাছে অগ্রগন্য।"

যখনই স্নান করবেন বা মুখ ধোবেন এই শুভ্র, বিশুদ্ধ সাবানটি ব্যবহার করুন—দেখবেন আপনার ত্বক কত সুন্দর ও মসৃণ হয়ে উঠেছে। এর সরের মত ফেণার রাশি আপনার ত্বককে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে তোলে, এর সুগন্ধ প্রতি বারের স্নানকে করে তোলে একটি আনন্দময় অনুভূতি। সারা পৃথিবীর চিত্রতারকাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন—
প্রতিদিন লাক্সের সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্ন নিন।

বিশুদ্ধ, শুভ্র **লাক্স টয়লেট সাবান**

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

নিরুপা রায় মুক্তি ফিল্মের 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত' চিত্রের সুন্দরী তারকা

LTS. 561-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রচার।

পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

পৃথিবীর সকল জিনিসই ক্রমবিকাশের পথে গড়ে উঠেছে, সুতরাং সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ঘটনা-পারম্পর্য নিয়ে তাদের প্রত্যেকের এক একটি ইতিহাস আছে। সামাজিক মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কালের ঘটনা স্রোতকে নিরীক্ষণ ও একত্রিত করে সুসম্বদ্ধভাবে তাদের ইতিহাস রচনার কাজে মনোনিবেশ করে। বিশ্বসভ্যতার গোড়ার দিকে কালি-কলমের সাহায্যে গ্রন্থ বা পুঁথি লেখার যখন প্রচলন ছিল না, তখন স্মৃতির আশ্রয় নিয়ে মুখে মুখে চলে আসা কথা-কাহিনীকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল যেন ইতিহাসের রীতি ও সেই রীতির চাক্ষুষ নিদর্শন পাওয়া যায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের যুগে। মহাভারতের সঞ্জয় প্রভৃতি সূত-শ্রেণীর লোকেরা ঐ ধরণের জীবন্ত ইতিহাসের স্বাক্ষ্য-স্বরূপ ছিল। তারা স্তাবক, গায়ক প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। পরে কালি-কলম ব্যবহারের প্রচলন যখন শুরু হলো তখন গাছের ছালে বা পাতায় বহুদিন ধরে মুখে মুখে চলে আসা কথা-কাহিনীগুলিকে লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ হলো, আর তা থেকেই মহাকাব্য, অবদান, জাতক, পুরাণ প্রভৃতি সাহিত্য পুঁথি বা গ্রন্থের আকারে আত্মপ্রকাশ করলো। তবে একথা ঠিক যে ভারতবর্ষে অন্ততঃ ঘটনাবলীর শৃংখলা ও পারম্পর্য রক্ষা করে ও দিনপঞ্জীর সঠিক তালিকা নিয়ে প্রমাণযোগ্য ইতিহাস রচিত হলো গৌতম বুদ্ধের সময় থেকে। আর সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত সামাজিক দৈনন্দিন ঘটনা ও তার সভ্যতাও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে ভারতে ইতিহাসের গতি চলে আসছে অতীতের স্মৃতিকে বহন করে। পেছনেও আছে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা-স্রোতের মতো কাহিনী ও সে কাহিনীর উপাদান বাঙলাদেশেরই রসসিঞ্চিত জীবন ও সংস্কৃতির গৌরবময় সম্পদে পূর্ণ।

ভারতীয় সংগীতে 'পদ' ও 'কীর্তনা' শব্দ-দুটির প্রচলন মোটেই আধুনিক নয় ও সেই প্রচলন শুধু বাঙলাদেশের চৌহদ্দীতেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুতে পরিপুষ্ট বিভিন্ন ভাবধারাকে নিয়ে বিভিন্ন রূপে তার প্রচলন আছে। তবে বাঙলার সজল সবুজ মাটিতে ঐ পদ ও কীর্তনের সার্থক বিকাশ বেশ একটু বিশিষ্ট রকমের। বাঙলা-দেশের পদাবলী কীর্তনের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণলীলা কিংবা রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলাকে

নিয়েই গড়ে উঠেছে; আর পদ-কীর্তনের কলেবর পরিপুষ্ট করেছেন মরমীয়া বৈষ্ণব-সাধকরা তাঁদের অন্তরের নিবিড় প্রেম ও ভক্তির নিবেদন দিয়ে।

বাঙলার অভিজাত কীর্তনগীতির ঐতিহাসিক আলোচনায় 'পদ' 'পদাবলী' ও 'কীর্তন' শব্দ তিনটির অর্থ ও ব্যবহারিক সার্থকতা সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলা দরকার। 'পদ' অর্থে গীতি বা গানকে বোঝায়। খৃষ্টপূর্ব সমাজের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে 'পদ' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে 'পাঠ্য' ও 'গান্ধর্ব' শব্দ-দুটির উল্লেখ দেখা যায়। 'পাঠ্য' ছিল ছন্দোবদ্ধ কথা বা সাহিত্য-সংবলিত গান আর 'গান্ধর্ব' ছিল বৈদিকোত্তর মার্গশ্রেণীভুক্ত স্বর, পদ ও তালযন্ত্র গান। সুতরাং সাঙ্গীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় — 'পদ' 'পাঠ্য' ও 'গান্ধর্ব' শব্দ তিনটির অর্থ প্রায় একই ধরণের। নাট্যশাস্ত্রে 'যৎ কিঞ্চিদক্ষরাকৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম' বলে পদের অর্থ নিবন্ধ ও অনিবন্ধ ভেদ দু রকম বলা হয়েছে। নিবন্ধ পদ সতাল বা তালযন্ত্র ছন্দোবদ্ধ আর অনিবন্ধ, অতাল অর্থে তালবিহীন আলাপের মতো গান। তাছাড়া পদের আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও লাক্ষণিক অর্থ আছে। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতে পদ-বর্ণনার নিদর্শন আছে ও বিশেষ করে নির্বাসিত যক্ষের উদ্দেশ্যে অশ্রুসিক্তা যক্ষপত্নীর গোত্রাঙ্কপূর্তিত 'বিরচিত পদং' তথা আভিচারিক গীতি বা মূর্ছনা সংগীতের জগতে বেশ অর্থপূর্ণ। বাঙলার অভিজাত নিবদ্ধ প্রবন্ধ জাতীয় কীর্তনগান শুধুই 'পদাবলী' নয়, 'মহাজন-পদাবলী' নামেও খ্যাত। বিশেষ খ্যাতি বা যশ, বিদ্যা ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রকেই 'মহাজন' নামে অভিহিত করা হত। তবে কীর্তন গানে 'মহাজন' শব্দটি বিশেষভাবে পদগীতি-রচয়িতা ভগবদসাধক মরমী বৈষ্ণব-সাধকদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর বিভিন্ন সময়ে তাদেরই রচিত 'রাধাকৃষ্ণলীলা' সম্বন্ধীয় পদগানগুলি 'পদাবলী' নামে পরিচিত। তবে বাঙলাসাহিত্যের গীতিকাব্যগুলি ও পদাবলী নামে অভিহিত। পদাবলীগানে 'রাধা' শব্দটির ঐতিহাসিক ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'আরাধ্য বা আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদা নারী'। অনেকের মতে লোকগীতির ভেতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা গোপী 'রাধা' নামে পরিচিতা হন। ভাগবতে 'অনয়ারাধিতো নূনং' প্রভৃতি শ্লোকে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ-নির্বাচিত একজন প্রিয়তমা গোপীকেই 'রাধা' হিসাবে ইঙ্গিত করেছে। পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা বা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা লীলাসঙ্গিনী।

'কীর্তন'-শব্দটি যশোগীতি বা কীর্তিগাথা গানেরই নামান্তর। আসলে কীর্তিগাথাগান থেকেই 'কীর্তন' শব্দ ও কীর্তনগানের সৃষ্টি। বাচস্পত্য-অভিধানকার 'কীর্তি' শব্দটি 'খ্যাতি' বা 'যশঃ' অর্থেই ব্যবহার করেছেন। মনু 'যশশ্চ কীর্তিশ্চ' প্রভৃতি শ্লোকে যশ বা কীর্তিসূচক গানকেই 'কীর্তন' বলেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-প্রকাশক কীর্তিগানকে 'কীর্তন' বলা হয়েছে। ভাগবতের 'গীতকীর্তিঃ' প্রভৃতি শব্দ কীর্তন বা সংকীর্তনেরই সূচক। এই গীত-কীর্তি বা কীর্তিগাথাগানের নিবদ্ধ প্রবন্ধ রূপের পরিচয় দিয়েছেন খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গুণী শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীত-রত্নকার'-গ্রন্থে। তিনি বলেছেন ঃ 'করণ'-প্রবন্ধে যে মঙ্গলারম্ভ, আনন্দবর্দ্ধন ও কীর্তিলহরী তিনটি গানশ্রেণীর উল্লেখ আছে কীর্তিগান 'কীর্তন' সেই শোষোক্ত 'কীর্তিপূর্বিকালহরী'-শ্রেণীর অন্তর্গত। ভাগবতের আধার স্বরূপ পঞ্চরাত্রসংহিতা ও প্রাচীন মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণেও বাসুদেব বা বিষ্ণুর মহিমাপ্রকাশক গানকে 'কীর্তন'-আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া খৃষ্টীয় দ্বিতীয় অব্দে সংকলিত মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'সংকীর্তন'-শব্দটি স্তুতিমূলক গানের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ "যজ্ঞেষাং সাত্ত্বিকে ভাবঃ কর্ণ সংকীর্তনং চ যৎ" প্রভৃতি। পরবর্তী বৈষ্ণবতন্ত্রকাররা উচ্চকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিগান করাকে 'সংকীর্তন' আখ্যা দিয়েছেন' যেমন 'নগর-সংকীর্তন', 'নাম-সংকীর্তন' প্রভৃতি। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বৈষ্ণব-

স্মৃতিকার গোপালভট্ট 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে 'সংকীর্তন' অর্থে 'কীর্তন'-শব্দই ব্যবহার করেছেন। সনাতন গোস্বামী স্তুতিমূলক 'কীর্তন'-শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'সংকীর্তনং নামোচ্চারণং গীতং স্তুতিশ্চ নামময়ী'। মোটকথা খৃষ্টীয় ১৫শ ১৬শ অব্দের বাঙলার সমাজে 'নামকীর্তন' বা নাম-সংকীর্তন' শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন লীলা-বিষয়ক প্রবন্ধগান নিয়েই গড়ে উঠেছিল। নামকীর্তনও পদাবলী-কীর্তনের অঙ্গীভূত। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নামকীর্তনের আগে বাঙলার সমাজে নামগানের ('নামগান') প্রচলন ছিল। নামগান প্রধানত ভাগবতের দ্বারকালীলার প্রশংসায়ই মুখরিত ছিল। চৈতন্যদেব ও তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব-পদকর্তারা তথা বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, উমাপতি ধর, মিথিলার উমাপতি ওঝা, নরহরিদাস, বাসুদেব ঘোষ, নয়নানন্দ, বৃন্দাবন দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি দ্বারকার পরিবর্তে প্রধানভাবে বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও বাল্যলীলার মহিমা ও মাধুর্যকেই কীর্তনগানে ফুটিয়ে তোলেন। মোটকথা নেও-বৈষ্ণবিজম Neo-Vaishnivism তথা বৈষ্ণবধর্মের নব-রূপায়ণের প্রবাহে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও তাঁর অপ্রাকৃত শৈশব-কাহিনীই বিশেষভাবে রূপায়িত হয়েছে।

চৈতন্যদেব নামকীর্তন প্রবর্তন করার আগে ও সমসময়ে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে ও বিশেষ করে বর্ধমান, বীরভূম ও রাঢ়ের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পালাগানের বিশেষ প্রচলন ছিল ও তার বিষয়বস্তু ছিল ভাগবতের অন্তর্গত গোষ্ঠলীলা মাথুর, মানভঞ্জন, রাস, নন্দোৎসব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাকাহিনী। পালাগানের পাশাপাশি প্রচলিত ছিল মনসাদি বিভিন্ন মঙ্গলগান, বৌদ্ধ চর্যা ও বজ্রগীতি, গীতগোবিন্দের পদগান, পাঁচালী, ঝুমুর, বাউল, যাত্রাগান, কৃষ্ণকীর্তন ও কালীকীর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা। পাচালী, ঝুমুর, মঙ্গল প্রভৃতি গান কিন্তু পল্লী-অঞ্চলের সাদাসিধে ধরণের লোকগীতি ছিল না। তাদের মধ্যে ছিল ধাতু, বিচিত্র রকমের তাল, লয়, ছন্দ প্রভৃতির সমাবেশ, আর ছিল অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল রাগ-রাগিনীদের সহযোগ। চর্যাপদগীতি ছিল আধ্যাত্মিক, কিন্তু গীতগোবিন্দের গান আধ্যাত্মিকী অথচ তা থেকে উন্নত ধরণের ছিল। অনেকে জয়দেব ঠাকুরের গীতগোবিন্দকে নিছক সহজ সরল 'পালাগান'-নামে অভিহিত করেন। কিন্তু একথা ঠিক যে, গীতগোবিন্দের পদগান ছিল বেশ মার্জিত রুচিসম্পন্ন নিবন্ধশ্রেণীর অন্তর্গত, আর তার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও মাঝে মাঝে ত্রিপদী রচনার ভঙ্গিমা এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভাস, যবাড়ী, কামোদ, তোড়ী, গৌড় বা গৌড়ী, কর্ণাট, শ্রী, মালব, গুর্জরী, বসন্ত, আসাবরী, ভৈরবী, গান্ধার, পটকমঞ্জরী, মল্লার, ভাটিয়ার, মায়ূরী প্রভৃতি ক্ল্যাসিক্যাল রাগ-রাগিণীদের সমাবেশও সেকথা প্রমাণ করে। অবশ্য তখনকার এসব রাগের স্বররূপের এখন যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। কবি জয়দেব গীতগোবিন্দগান, পশ্চিম-বাঙলার মঙ্গল, বাউল পাঁচালি ও নামগান, ও বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের অজস্র লৌকিক প্রেমকাহিনীজড়িত পূর্ববঙ্গ-গীতিকার কথা ও ভাবকে অবলম্বন করে পদাবলী কীর্তনের কলেবর পরিপুষ্ট হয়েছিল বলা যায়। অনেকের অভিমত যে, পদাবলী কীর্তনে রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলার কাহিনী নাকি পূর্ববঙ্গগীতিকার অর্জিত লৌকিক নায়ক-নায়িকার ভূমিকা ও প্রেমকথাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এনিয়ে বিদগ্ধজন সমাজে মতভেদও কম নেই। তবে একথা সত্য যে, পদাবলী-কীর্তনে খৃষ্টীয় ১১শ ১২শ অব্দের চর্যায় গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত ও সঙ্গীতশাস্ত্র সমর্থিত অভিজাত রাগ-রাগিণীগুলিকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছিল। অবশ্য কীর্তনে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। মধ্যযুগীয় কীর্তনগানে প্রামাণিক সংস্কৃতশাস্ত্রগুলির সমাদর যথেষ্ট ছিল। শোনা যায়, কীর্তনে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরাদি ছাড়া

তানপুরাদি তার-বাদ্যযন্ত্রেরও নাকি প্রচলন ছিল। তাছাড়া কীর্তনে আলাপেরও রীতি ছিল। ঘনশ্যাম-নরহরি 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

বারবার প্রণমিয়া সবার চরণে,
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট-করণে।
রাগিণী সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা,
শ্রুতি-স্বর-গ্রাম-মূর্ছনাদি প্রকাশিলা।

তিনি আরো লিখেছেন : 'আলাপয়ে নানা ভাতি — উপমা কি দিতে, কিংবা 'গায়ক-সকল সে আলাপ-বর্ণ-রীতে'। এথেকে কীর্তনে আলাপের রীতি ছিল বোঝা যায়।

নাম-কীর্তনের পর খৃষ্টীয় ১৬শ অব্দে ঠাকুর নরোত্তমদাস যখন নিছক নিবন্ধ প্রবন্ধ শ্রেণীর ক্ল্যাসিক্যাল ধ্রুবপদ বা 'ধ্রুপদী'-গানের ভিত্তিতে খেতরী-মহোৎসবে রসকীর্তন বা লীলা-কীর্তন প্রবর্তন করেন তখন ভক্তিরসাত্মক লীলাগীতি কীর্তনের মান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নীত হয়েছিল বলা যায়। কীর্তনের পদ ব্রজবুলিভাষায় রচিত। ব্রজবুলি কিন্তু বৃন্দাবন প্রভৃতি অঞ্চলের কথ্য ব্রজভাষা নয়, এটি প্রাচীন অবহট্‌ঠ ভাষারই ক্রমপরিণতি। তখনকার সময়ে মিথিলা বাঙলা ও উড়িষ্যার ভাষা প্রধানতঃ ব্রজবুলি ছিল। আসামে শংকরদেব প্রবর্তিত ব্রজবুলিভাষা একটু ভিন্ন রকমের ছিল। ঠাকুর নরোত্তম লীলাকীর্তনের আগে গৌরাঙ্গ-বন্দনা হিসাবে 'গৌরচন্দ্রিকা' প্রবর্তন করেন। সেটি অনেকটা অভিজাত প্রবন্ধগানের আগে আলাপের দ্বারা রাগ, তাল ও ভাবের প্রকটিকরণ অর্থে আসর-জমানোর মতো ছিল। ঠাকুর নরোত্তমের কীর্তন-গীতিধারা গড়েরহাটি-পরগনায় জন্মলাভ করেছিল বলে 'গরাণহাটি'-পদ্ধতি নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু সেই বিলম্বিত স্থির ধীর প্রসন্ন-গম্ভীর রীতির গান বেশীদিন চললো না। রুচি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে গরাণহাটির ভিত্তিতে মনোহরসাহি-পরগনা থেকে 'মনোহরসাহি' বর্ধমান জেলায় রাণীহাটি-পরগনা থেকে 'রেণেটি', সরকার-মন্দারণ থেকে 'মন্দারিণী' ও ঝাড়খণ্ড অঞ্চল থেকে 'ঝাড়খণ্ডী' পদ্ধতিগুলির সৃষ্টি হয়। মোটকথা গুরুগম্ভীর রীতি থেকে কীর্তনগানের রীতি ক্রমশই সহজ সরল ধারার দিকে চালিত হয় ও তার পূর্ণপরিণতি লক্ষ্য করি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা-সমাজে মধুসূদন কিন্নর তথা মধুকাণ-প্রবর্তিত ঢপগান বা ঢপকীর্তনের গানে।

উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে কথার 'সঙ্গে সঙ্গে রাগ, তাল ও বাদ্যের সমাবেশ যেমন অপরিহার্য, বাঙলার পদাবলী-কীর্তনের ধারাও তদনুরূপ। কিন্তু তাহলেও কীর্তনে রস ও ভাবের বিকাশই ছিল প্রধান। তাছাড়া বাঙলার পদাবলী-কীর্তন অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত শ্রেণীরই সমপর্যায়ভুক্ত ছিল কেননা এটিও আসলে নিবন্ধ প্রবন্ধ গীতির অন্তর্ভুক্ত। গরাণহাটি-কীর্তনে প্রধানতঃ ১০৮টি, মনোহরসাহিতে ৫৪টি, রেণেটিতে ২৬টি ও মন্দারিণীতে ৯টি তালের ব্যবহার হয়। ঝাড়খণ্ডীপদ্ধতি একরকম লোপই পেয়েছে।

পদাবলী-কীর্তনে কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট এ পাঁচটি উপাঙ্গের সহযোগ অনিবার্য। কীর্তনের 'আখর' হিন্দুস্তানী-সঙ্গীতের তানের সমপর্যায়ভুক্ত না হলেও কতকটা সমগোত্রীয়। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে কীর্তনে ৬৪টি রসের অবতারণা থাকে।

কীর্তনে পালা গান করে মিলন গান করার রীতি আছে। তাছাড়া যুগলরূপ, প্রকাশ ও

বলাস, পূর্বরাগ ও অনুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, মিলন প্রভৃতি ১২টি তত্ত্বের সমাবেশ থাকে ও তাতেই কীর্তনের রূপ রস ও ভাব-মাধুর্যকে নিয়ে পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ পায়। মোটকথা বাঙলার পদাবলী-কীর্তনে যেমনটি রূপ, রস, ভাব ও প্রেমের নিবিড়তা দেখা যায় তেমনটি পৃথিবীর আর কোন গানে আছে কিনা জানি না। কীর্তনের এই অংশটি ব্যাকরণ বা সাহিত্য পর্বের কিছুটা অন্তর্ভুক্ত হলেও ঐতিহাসিক আলোচনায় এদের স্থান আছে।

পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস বিস্তৃত। সুতরাং তার যথাযথ সম্পূর্ণ আলোচনা কোন ক্ষুদ্র সময়ের পরিধির মধ্যে করা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক আলোচনা ছাড়া কীর্তন গানে শাস্ত্রীয় বিচারেরও দিক আছে, আর আছে তার বিশাল সাহিত্য ও অলংকার-মাধুর্যের আলোচনার দিক। তাছাড়া ভারতের প্রায় সকল দেশেই ভজনাত্মক কীর্তনধারার প্রচলন আছে, পদাবলী-কীর্তনের আলোচনায় তাদেরও তুলনামূলকভাবে কিছুটা বিবরণ দেওয়া উচিত। পরিশেষে বাঙলাদেশের পদাবলী-কীর্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায় যে, অপরাপর দেশের কীর্তনগীতি থেকে বাঙলার পদাবলী-কীর্তন রূপে, বিকাশে ও প্রকৃতিতে বেশ কিছুটা ভিন্ন। বাঙলার পদাবলী-কীর্তন বাঙালীজাতিরই নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। তার ঐতিহাসিক রূপের বিকাশ বাঙলাদেশের রস-সিঞ্চিত মন ও অনাবিল অধ্যাত্ম সাধনার মর্মকথা প্রকাশ করে।

'সাধনা' পর্বের রবীন্দ্রনাথ

হরপ্রসাদ মিত্র

১২৯৬ সালের ২৬-এ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন; সে কবিতার নাম 'ধ্যান'; 'মানসী' বইয়ের মধ্যে সেটি ছাপা হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন —

আমি অশান্ত বিরামবিহীন
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

এই 'তুমি'-র রহস্য ভেদ করবার ভূমিকা হিসেবে নয়, — ১৮৯০ থেকে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বছর দশেকের কর্মব্যস্ততার কথাপ্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সে আত্মকথা স্মরণীয়। 'রাজা ও রানী' তখন সবে বেরিয়েছে, — তার আগে লেখা হয়েছে 'মায়ার খেলা', —তারও আগে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। 'কড়ি ও কোমল'-ও সেই পর্বের রচনা।

১৮৯০-এ তাঁর 'মানসী' বেরিয়েছিল। 'ছিন্নপত্র' এবং অন্যান্য চিঠিপত্রের মধ্যে তাঁর সে সময়ের জীবনকথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। সেইসব বর্ণনার মধ্যে শিলাইদহ, কালিগ্রাম, সাহাজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি স্থাননামের উল্লেখ বার-বার চোখে পড়ে। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরে ১৩৪৯ সালে তাঁর 'চিঠিপত্র' প্রথম খণ্ড ছাপা হয়। প্রথম খণ্ডে সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর কাছে লেখা যে ছত্রিশখানি চিঠি বেরিয়েছে, তারই চতুর্থ চিঠির শেষে সম্পাদক এই জায়গাগুলির পরিচয় দিয়েছেন — 'বিরাহিমপুর, সাহাজাদপুর ও কালিগ্রাম তিনটি জমিদারি পরিদর্শনের জন্য কবি জলপথে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। বিরাহিমপুর পরগণার কাছারি শিলাইদহে, কালিগ্রাম পরগণার কাছারি পতিসর গ্রামে। সাহাজদপুর গ্রামের নামেই পরগণার নাম। পদ্মা থেকে ইচ্ছামতী ও বড়াল নদী দিয়ে চলন বিলে যাওয়া যায়। সাহাজাদপুর যমুনার একটি শাখানদীর ধারে, পতিসর চলন বিলের অনতিদূরে নাগর নদীর উপর।' জমিদারির কাজে এইসব অঞ্চলে, এবং অন্যান্য কাজে অন্যান্য অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ রবীন্দ্রনাথের সেই নবযৌবনের সন্ধিকাল যে খুবই চাঞ্চল্যে কেটেছিল, সেকথা তিনি ঠিকই জানিয়ে গেছেন। ১৮৯০-এ, অর্থাৎ 'মানসী' প্রকাশের সময়ে তাঁর বয়স ছিলো কুড়ির কোঠার শেষ প্রান্তবর্তী। তার বছর তিনেক আগে, বাংলা ১২৯৩ সালে তাঁর 'কড়ি ও কোমল' যখন ছাপা হয় তখনকার এবং তারও কয়েক বছর আগেকার মনোভাব সম্বন্ধে পরিণত বয়সে তিনি জানিয়েছিলেন — 'যৌবন হচ্ছে জীবনের সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে ..... আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্‌বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষায় আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাংলা চাদর, তার খুঁটে বাঁধা ভোরবেলায় তোলা একমুঠো বেলফুল, পায়ে একজোড়া চটি।' ১৩৪৬ সালের পৌষ মাসে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'-সংস্করণের জন্যে 'কড়ি ও কোমল'-এর নতুন ভূমিকাতে তিনি এই স্মৃতিকথা জানিয়ে গেছেন,—এবং সেই সূত্রে এও

জানিয়েছিলেন যে, সেই সাজসজ্জাতেই 'থ্যাকারের দোকানে বই কিনতে গেছি কিন্তু এর বেশি পরিচ্ছন্নতা নেই, এতে ইংরেজ দোকানদারের স্বীকৃত আদবকায়দার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ হত।'

কিন্তু উপেক্ষার ভাবটাই প্রধান নয়, নবযৌবনের আকুতির মর্জিটাই সে-পর্বের প্রধান ধর্তব্য বিষয়। 'কবির অহংকার' নামে একটি চতুর্দশপদীতে তিনি সেই 'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যেই বলেছিলেন — 'প্রাণে মরে গানে কি রে বেঁচে থাকা যায়!' তাই 'চিত্রা'-র আগেই তিনি বিশ্ববাসীকে সে কবিতায় এই আহ্বান শুনিয়েছিলেন—

কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল—
মোরে তোমাদের মাঝে করো গো আহ্বান।
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল—
দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান।
তারপরে একসাথে এসো কাজ করি
কেবলি বিলাপ গান দূরে পরিহরি।

'বিজনে' নামে আর একটি চতুর্দশপদীতে তাঁর সে সময়ের অহং ও বিশ্বভাবনার আর একদিক ব্যক্ত হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন —

আমারে ডেকো না আজি, এ নহে সময়—
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন,
রুধিয়া রেখিছি আমি অশান্ত হৃদয়,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন।
মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়—
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।

'কড়ি ও কোমল'-এর 'সিন্ধুতীরে', 'সত্য', 'আত্মাভিমান', 'আত্ম অপমান', 'ক্ষুদ্র আমি' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এই ধরণের আত্ম-ভাবনার বহুতর পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে। কিন্তু এ আত্মভাবনা সংকীর্ণ নয়,—আত্মসর্বস্বতা নয়। 'মানসী'-র 'আমি অশান্ত বিরাম-বিহীন'—ভাবনাটাই এইসব রচনার মধ্যে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছিল। 'কড়ি ও কোমল'-এর 'পত্র' থেকে এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশদতর আত্মব্যাখ্যান স্মরণ করা যেতে পারে; তিনি জানিয়েছিলেন —

মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মতো
ভোগসুখে জীর্ণ হয়ে থাকা,
ঝুলে থাকা বাদুড়ের মতো শির-নত
আঁকড়িয়া সংসারের শাখা,
জগতের হিসাবেতে শূন্য হয়ে হায়
আপনারে আপনি ভক্ষণ,
ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া জলবিম্ব প্রায়—
এই কিরে সুখের লক্ষণ!

পরের স্তবকে আরো জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন—'এই অহিফেন-সুখ কে চায় ইহাকে!'

'কড়ি ও কোমল'-ই তাঁর প্রথম কবিতার বই যাতে মনের নানা কথা এবং বাইরের বিচিত্র জগৎ তুল্য সমাদর পেয়েছে। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'—এ ঘোষণা 'কড়ি ও কোমলে'র আমল থেকেই বিশেষভাবে শোনা গেল,—সেই সঙ্গে মৃত্যুর পদধ্বনি,— প্রকৃতির বন্দনা, — যৌবনের প্রেম, স্বপ্ন, বিচিত্র অঙ্গীকার!

'কড়ি ও কোমল' ছাপা হবার বছর খানেক আগে ১২৯২ সালের বৈশাখ থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুর বাড়ির 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর'-এর সুরে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ শিশুকবিতাটি তো বটেই, তা ছাড়া তাঁর এই ধরণের আরো কয়েকটি কবিতা বেরিয়েছিল 'বালক'-এর বিভিন্ন সংখ্যায়, 'মুকুট' এবং 'রাজর্ষি' দেখা দিয়েছিল সেই 'বালক' পত্রিকাতেই। ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা আরো আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, 'মুকুট', 'রাজর্ষি' এবং

'বিসর্জন'-এর মধ্যে সেই পারিবারিক মৈত্রী কবির ব্যক্তিগত প্রীতির স্বাক্ষরে চিরস্থায়ী হোলো। এই সব প্রীতি-শ্রদ্ধা আনন্দকথার পাশাপাশি চলছিলো ব্যঙ্গ-কৌতুকের স্রোত। 'ভারতী' এবং 'বালক', সে-পর্বের এই দুই পত্রিকাতেই তাঁর গদ্য-পদ্য উভয় বাহনে বাহিত ব্যঙ্গরচনার প্রাচুর্য দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সোলাপুরে জজিয়তি করতেন। অসুস্থ হয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন আমেদাবাদে,—আমেদাবাদ থেকে সমুদ্রতীরবর্তী বন্দোরায়। রবীন্দ্রনাথও কিছু দিন সেসব অঞ্চলে ঘুরে এলেন। সেই ভ্রমণের মধ্যেও বিচিত্র রচনার স্রোত ছিল অপ্রতিহত। ১২৯২-এর শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী'তে 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি; নব্য হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের তখন প্রবল কথা-কাটাকাটি চলছিলো। রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন নব্য হিন্দুসমাজ; তাঁদের 'আর্যামি'-র নিন্দা করে 'কড়ি ও কোমল'-এরই আর একখানি 'পত্র'-কবিতায় তিনি লিখেছিলেন —

দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে,
দাঁত কপাটি লাগে তাদের দাঁত-খিঁচুনির ভঙ্গি দেখে।

জোড়াসাঁকোয় বসে এ-কবিতা লেখবার অব্যবহিত আগেই উত্তর-বাংলার নদীপথে তিনি কিছুদিন কাটিয়ে এসেছিলেন। সেই ভ্রমণের উল্লেখ আছে কবিতাটির আদ্যন্তব্যাপী নানা মন্তব্যে, এবং সেই সঙ্গে সে সময়ের সাহিত্য সংস্কৃতির হালচালের কিছু পরিচয় আছে এইসব ছত্রে —

জলে বাসা বেঁধেছিলেন, ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি—
সবাই গলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে কলস নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখানে যে বাস করা দায় ভন্‌ভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে,
কানে যখন তালা ধরে উঠি যখন হাঁপিয়ে
'কোথায় পালাই' কোথায় পালাই'—জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।

প্রকৃতি, প্রেম, সমাজ, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিলনা সে সময়ে। আর, এই সব বড়ো-বড়ো ভাবনার ফাঁকে-ফাঁকে স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে তিনি জানিয়েছেন ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁর কৌতুক-সুস্মিত আগ্রহের কথা,— বলেছেন, 'কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে বনিবনাও আর কিছুতে হয়ে উঠ্‌ল না দেখছি,' — অনুযোগের সুরে জানিয়েছেন, 'পাছে তোমাদের চিঠি পেতে এক দিন দেরি হয় বলে কোথাও যাত্রা করবার সময় আমি একদিনে উপরি উপরি তিনটে চিঠি লিখেছি। কিন্তু আজ থেকে নিয়ম করলুম চিঠির উত্তর না পেলে আমি চিঠি লিখব না'! 'সাধনা' পত্রিকার কাজ তখন চলছে, — তারই মধ্যে সহজ ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে জানিয়েছেন — 'সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়! যে অবস্থার মধ্যে অগত্যা থাকতেই হবে তার মধ্যে যতটা পারা যায় প্রাণপণেই নিজের কর্তব্য করে যেতে হবে—তারই মধ্যে যতটা ভাল করা যায় তা ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে বল।'

মুক্তধারা

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

মুক্তধারা রবীন্দ্রনাথের লিখিত একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন প্রভৃতি নাটিকাগুলি মুক্তধারার পূর্ববর্তী রচনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির লৌহশৃঙ্খল দৃঢ়তর হইতেছে, পরৈশ্বর্য লোলুপতা, সাম্রাজ্যবাদ ও উৎকট জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান হইতেছে, এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কবি ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে ইহা রচনা করেন। যন্ত্রসভ্যতা ও উৎকট জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদে এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি মুখর। মুক্তধারা রচনার কিছুকাল পূর্বে কবি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায়ের মতে মুক্ত ধারা ও রক্তকরবী "এই দুইটি নাটকেরই ভাব ও চিন্তার পটভূমি সমরোত্তর ইউরোপ অথবা সাধারণ ভাবে যুদ্ধপরবর্তী সমগ্র পৃথিবী। ...কোনও একটি বিশেষ রূপকের মধ্য দিয়া আমাদের বিশেষ কালের একটি বিশেষ চিন্তাধারা কবির অনুভূতির মধ্যে ধরা দিয়েছে এই দুইটি নাটকেই।...এই পটভূমি মনের পশ্চাতে রাখিয়া "মুক্তধারা" ও "রক্তকরবী" পাঠ করিলে উহাদের মর্মোদ্ধার সহজ হইবে।" (রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা।)

কথা সার

মুক্তধারার গল্পাংশ কাল্পনিক, ঐতিহাসিক নহে। সংক্ষেপে গল্পটি এই ঃ উত্তরকূট পার্বত্য-প্রদেশ। সেখানকার রাজা রণজিতের সভার যন্ত্ররাজ একটি ঝরণার বাঁধ বাঁধিয়েছেন। ঝরণাটির নাম মুক্তধারা। মুক্ত ধারা নির্ঝরিণী বিজিত প্রদেশ শিবতরায়ের অধিবাসিদের পানীয় জোগায়। ও ভূমির উর্বরতা সাধন করে। শিবতরাই-এর প্রজাদের নিপীড়নেরই উদ্দেশ্যে যন্ত্ররাজ বিভূতি এই লৌহ যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। বহু কাল ও অর্থ এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়াছে। বাঁধ বাঁধিতে গিয়া বহু শ্রমিক বন্যার স্রোতের জলে প্রাণ হারাইয়াছে। বিভূতির এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার জন্য উত্তরকূটের লোক ভৈরব-মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে যাইতেছে। রাজা ও সেখানে যাইবার উদ্দেশ্যে পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। যুবরাজ অভিজিৎ পরদুঃখকাতর, শিবতরাইয়ের অনিষ্টকর এই লৌহ যন্ত্র তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। শিবতরাইয়ের পণ্য যাহাতে বিদেশে যাইতে পারে তজ্জন্য তিনি নন্দীসঙ্কটের নিম্নিস্থ পথটী খুলিয়া দিয়াছেন, এই সংবাদ রাজার কানে আসিলে তাঁহাকে বন্দী করা হইল। শিবতরাইয়ের প্রজারা ইহাতে বড় ক্ষুব্ধ হইল। তাহাদের নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী। রাজার খড়্গ বিশ্বজিত মোহনগড়ের অধিপতি, তাঁহার চেষ্টায় বন্দীশালায় আগুন লাগিয়ে অভিজিত মুক্ত হইলেন। মুক্ত হইয়াই তিনি মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিতে অগ্রসর হইলেন। রাজপুত্র সঞ্জয় ও বিশ্বজিতের বাধা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। যন্ত্র রাজ বিভূতির যন্ত্রে কিছু ত্রুটী ছিল। সেইখানে অভিজিত যন্ত্রাসুরকে আঘাত করিলেন, যন্ত্রাসুর সেই আঘাত তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল। ভগ্ন যন্ত্রপথের মধ্য দিয়া মুক্ত ধারার মুক্ত স্রোত তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

কুমার অভিজিৎ নাটকটীর একটী প্রধান চরিত্র। তিনি ভাবুক, প্রজাবৎসল ও পরদুঃখ

কাতর। শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্য অন্ন কষ্ট তাঁহার অসহ্য হওয়ায় তিনি নন্দীসংকটের পথ রাজার অনুমতি ব্যতীত মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা শিবতরায়ের প্রজামণ্ডলী সমৃদ্ধ হউক এই ছিল তাঁর বাসনা। শিবতরাই তৃষ্ণার জল হইতে বঞ্চিত হইবে এ কল্পনা হইল তাঁহার অসহ্য। বিভূতির নিকট তিনি লৌহ যন্ত্র ভাঙিয়া দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, "কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব ত লাভ হয়েছেই এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে গৌরব তা লাভ কর, বিভূতির নিকট এই ছিল তাঁর অনুরোধ। অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ভাঙিবার অধিকার তিনি নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র সঞ্জয় যখন অনুরোধ করিলেন 'চল যুবরাজ. রাজবাড়ীতে' অভিজিৎ তখন উত্তর দিলেন, "যেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে,...মুক্তধারার পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েচি তারই পথ খুলে দেবার জন্য।" সবাই যখন শত্রু হবে, আপন লোক যখন ধিক্কার দেবে, সইতেই হবে, এই হইল তাঁর পণ। রাজপ্রহরী উদ্ধব তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিল, "নন্দিসংকটের পথ কেন খুলে দিলে," যুবরাজ উত্তর দিলেন "শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্য দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।" তাঁহাকে যখন বলা হইল যে মহারাজের দয়ামায়া আছে তিনি ত তাঁহাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, তখন তিনি উত্তর দিলেন "ডান হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারিনে।" ইহার পরই যুবরাজ বন্দী হইলেন। বিশ্বজিতের চেষ্টায় মুক্তি পাইয়াই তিনি মুক্তধারার দিকে ছুটিলেন। বিশ্বজিৎ যখন বলিলেন, তাঁরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিবেন তখন বলিলেন, "না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েছে, সে একলা আমারই।" বিশ্বজিৎ তাঁকে বলিলেন, যে অন্ধকার আসিতেছে, তখন তিনি বলিলেন "যেখান থেকে ডাক এসেছে, সেইখান থেকে আলোও আসবে।" নাটকে ইহার পর আর অভিজিতের আবির্ভাব নাই। শিবতরাইয়ের ক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী অভিজিতের মুক্তির দাবী লইয়া রাজার কাছে আসিয়াছে, এমন সময় জলধারার শব্দের সঙ্গে কুমার সঞ্জয় আসিয়া সংবাদ দিলেন—"মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল।" সকলে স্তম্ভিত ও মর্মাহত হইল। গনেশ সর্দ্দার বলিয়া উঠিল "যুবরাজকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, তাহলে তাঁকে কি আর পাব না।" বৈরাগী ধনঞ্জয় উত্তর দিলেন "চিরকালের মত পেয়ে গেলি।"

ধনঞ্জয় বৈরাগী

অভিজিতের পরেই মুক্তধারার প্রধান চরিত্র বিজিত শিবতরাইয়ের জনমণ্ডলীর নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী। শিবতরাইয়ের লোকদের তিনি শিক্ষা দেন, "তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটী আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছবে না।" ধনঞ্জয় রাজার উৎসবে যোগদান করিতে চলিয়াছেন। বিদ্রোহীদের তিনি নেতা, রাজার কাছে যাইতে তাঁহার ভয় নাই. প্রজাদের সে ভয় আছে, কেন আছে তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "তোরা যে মনে মনে মারতে চাস্ তাই ভয় করিস। আমি মারতে চাইনে তাই ভয় করিনে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।" রাজার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের দেখা হইলে রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন কেন তিনি প্রজাদের কর দিতে বারণ করেন তখন বৈরাগী উত্তর দিলন, "উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার. ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।" রাজা যখন বলিলেন, বৈরাগী তোমার কপালে দুঃখ আছে, বৈরাগী তখন উত্তর দিলেন, "যে দুঃখ কপালে ছিল, সে দুঃখ বুকে তুলে নিয়েছি। দুঃখের উপরওয়ালা সেখানে বাস করেন।" ইহার পর বৈরাগীকে বন্দী করা হইল। বৈরাগীর

অনেকগুলি হৃদয়স্পর্শী গানের মধ্যে একটী এই ঃ—

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয় ভাঙা এই নায়ে।
মাঝেঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ঐ পারেতেই যাবে তরী
ছায়াবটের ছায়ে।

পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়
আমি অভয় মনে ছাড়ব তরী
এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরোলে জানি জানি
পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখ দিনের রক্তকমল
তোমার করুণ পায়ে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ কবির পূর্বে রচিত প্রায়শ্চিত্ত নাটক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত মুক্তধারা নাটক লিখিত হইবার পনের বৎসর পূর্বে লিখিত হয়। মনে রাখিতে হইবে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তনের বহু পূর্বে ধনঞ্জয় চরিত্রের সৃষ্টি।

ধর্ম্ম ও দেশপ্রেমের নামে সংকীর্ণতা

শিবতরাইকে বিধ্বস্ত করার জন্য লৌহ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যন্ত্ররাজ বিভূতির ইহা কীর্তি সন্দেহ নাই কিন্তু এই কীর্তির পিছনে কোন মহৎ প্রচেষ্টা নাই, দুর্বলের নিপীড়নই ইহার লক্ষ্য। বিজ্ঞান মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেক কিছু করিতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানের অপব্যবহার হইলে উহার ফল বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত বলা যায় আজ বিশ্বব্যাপী ধ্বংস যজ্ঞের যে আয়োজন চলিতেছে বিজ্ঞানই তাহার প্রধান ইন্ধন। সকল মন্দ কার্যকে সমর্থন করিবার মত সাফাইয়ের অভাব হয় না। মন্দ কার্যের সমর্থনের জন্য যখন ভগবানকে টানিয়া আনা হয় তখন হাস্য সংবরণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। প্রয়োজন হইলে শয়তানও ধর্মশাস্ত্রের বুলি ব্যবহার করে। মুক্তধারার বাঁধের জন্য ক্ষুব্ধ বিশ্বজিৎ যখন রাজা রণজিৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্য দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন ?" তখন রণজিৎ বলিলেন — যিনি উত্তর কূটের পুর-দেবতা আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধকরে তাকে উত্তর কূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দেবেন।" নিজেদের মন্দ কার্য্যের সমর্থনে দেবতার মৌন সম্মতি আছে, এই বোধ—দেবতাকে অপমানিত করে। দেবতা যে কাহারও একার নহে, স্বরূপ-বুদ্ধি লোকের ইহা বোধগম্য নহে। ঠিক এমনি ভাবে প্রাচীন ইহুদীরা মনে করিত, ঈশ্বর শুধু ইহুদীরই ঈশ্বর। উত্তর কূটের গুরুমহাশয় ছাত্রদের শিক্ষা দেন, উত্তরকূটের লোকের নাক উঁচু, নাক উঁচু খুব বড় জাতের লক্ষণ, শিবতরাইয়ের লোকেরা অসভ্য বর্বর তাহাদের নাক উঁচু নয়, তাদের ধর্ম ধর্মই নয়।" এইভাবে বালকদের শিক্ষাদান চলে। এই সংকীর্ণ শিক্ষা তাহাদের নিজেদের ধর্ম ও দেশের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দেয়। এই শিক্ষা এই ধর্মানুরাগ মানবতার পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ, শুধু উত্তর কূট নামক কাল্পনিক দেশে নহে, দেশে দেশে এই শিক্ষা প্রচার চলিতেছে। হিটলার জার্মানীকে বিশুদ্ধ রক্তের আর্য্য রক্তের অহংকারে স্ফীত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা ছাড়া আর কারও বাঁচিবার অধিকার নাই ইহাই ছিল নাৎসী জার্মানীর জীবন বেদ। সংকীর্ণতা প্রসূত এই যে স্বাদেশিকতা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মণীষী রাসেল একবার বলিয়াছিলেন—I would die rather than be a patriot. রোঁমা রোলা ও এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশে নিন্দিত হইয়াছিলেন। ধর্মের নামে অধর্মের অনুষ্ঠান, দেশানু-

রাগের নামে সঙ্কীর্ণতা ও নিষ্ঠুরতার অভিযানের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, যদিও এই নাটকের ইহা মূল প্রতিপাদ্য নহে।

লোক চরিত্র

দুই একটী সামান্য ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে লোক চরিত্রের অবস্থা বিশেষের ছবি দেখাইয়াছেন। এই ছবি হাস্য ও করুণ উভয় বিধ ভাবেরই উদ্রেক করে। উত্তর কূটের গুরু-মহাশয় রাজাকে বলিতেছেন — "আমরাই ত মানুষ তৈরী করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই কি পান আর আমরাই বা কি পাই তুলনা করে দেখবেন," মন্ত্রী যখন বলিলেন যে ছাত্ররাই ত তাঁদের পুরস্কার তখন গুরুমহাশয় উত্তর দিলেন, "তা ত বটেই। কিন্তু খাদ্য সামগ্রী যে বড় দুর্মূল্য।" গুরুমহাশয় সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্রশক্তি নিয়ন্তাদের নিকট ইহা নিবেদন করিতে পারিতেন।

যন্ত্ররাজ বিভূতির সাফল্যে উত্তরকূটের অধিবাসীরা সকলেই আনন্দিত বিশেষতঃ তাঁহার স্বগ্রাম বাসিরা, কিন্তু মনুষ্য স্বভাব বশতঃ কাহারও কাহারও মনে ঈর্ষার ছায়া দেখা দিয়াছে, একজন বলিতেছে "বিভূতি কামারের ছেলে তাকে কিনা রাজা ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করে নিলেন," আরেকজন বলিল বিভূতির লৌহযন্ত্র প্রস্তুতের কৌশল স্রেফ্ বেঙ্কটবর্মার কাছ থেকে চুরী করা।

যাত্রাওয়ালা হুব্বার অন্ধকারে পথ চলিতে বড় কষ্ট হইতেছিল, সে নিমকু বাতিওয়ালার কাছে অনুনয় করিয়া একটা বাতি চাহিয়াছিল। নিমকু তাহাকে দাম দিতে বলিল। হুব্বা ইহার উত্তরে যাহা বলিল, তাহা উপভোগ্য — "দামই যদি দিতে পারব তবে ত তোমার সংগে হেঁকে কথা কইতুম, মিঠে সুর বের করব কেন?"

রচনা রীতি

মুক্তধারা নাটকে পাহাড় ঘেরা উত্তরকূট প্রদেশ, সেখানকার উত্তর ভৈরব মন্দির — ধূপা-ধারে ধূপ জ্বলিতেছে, তালে তালে ঘন্টা বাজিতেছে আর গানের শব্দ আসিতেছে — শঙ্কর, শঙ্কর, জয় সংকট সংহর সংহর শঙ্কর শঙ্কর। মাঝে মাঝে সন্তানহারা অম্বা — আসিয়া বলিতেছে, সুমন্, বাবা সুমন্ কোথায় গেলি। কখনও দুই জোয়ান নাতি হারাইয়া বটুক বুড়া সকলকে সাবধান করিতেছে যেয়োনা ভাই, যেয়োনা ফিরে যাও। মুক্ত ধারা নাটকে হুব্বা আন্দু-অধিকারী দলে যাত্রা করে, নিমকু রাজধানীতে বাতি জ্বালায়, বনোয়ারী পদ্ম বীজের ও দেওতলীর দুখুনী ফুলওয়ালী ফুলের মালা তৈরী করে, হরিশ ঢাকী ঢাক বাজায় এবং নওসানুতে রাখালেরা ছাগল চড়ায়। শিবতরায়ে অনেক ভুট্টা হয় সেখানকার রেশম লোভনীয়। মোহন গড় রাজার খুড়া বিশ্বজিতের রাজ্য, সেখান হইতে গৌরীশিখর দেখা যায়, তাঁর গোষ্ঠে পঁচিশ হাজার গরু আছে, সেখানকার জাফারানের ক্ষেত ও সুবিস্তীর্ণ। রচনারীতিও বর্ণনাগুণে মধ্যযুগের সামন্ত শাসিত এই কাল্পনিক রাজ্যের ছবি পাঠকের মনে গাঁথিয়া যায়। এই বহিরংগের অন্তরালে প্রখর সমাজ-চেতনা ও বন্ধনমুক্তির অমৃতাস্বাদ লাভের আদর্শ নাটকের বিচিত্র ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া পাঠক চিত্তকে এক বিচিত্র আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

ব্রহ্মসভা না ব্রাহ্মসমাজ?

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামমোহন সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন— "রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক গল্প আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই। এই সকল গল্পের সহিত একটি গল্প এইরূপ ছিল যে রামমোহন রায় নিজের প্রচারিত ধর্মকে 'ইউনিভার্সাল রিলিজন' অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, আর যখনই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন তখনই তাঁহার অশ্রুপাত হইত। আমার পিতাঠাকুরও যখন ঐরূপ বলিতেন, তখন গদগদ হইতেন।"

রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন ও কিছুদিন রামমোহনের সেক্রেটারী হিসাবেও কাজ করেছিলেন। তাই তাঁর বয়ান নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারি। রাজনারায়ণ বসুর উল্লিখিত কথাগুলি রামমোহনের চিন্তাধারার যথার্থ পরিচায়ক হিসেবে যেমন মূল্যবান তেমনি মূল্যবান ব্রাহ্মসমাজের গোড়াপত্তনের ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ে। সৃষ্টির বহুমুখী ধারা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলো রামমোহনের সত্তার শিখর-ভূমি থেকে। ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি — মানুষের জীবনের এমন কোনো দিক ছিলো না যে তাঁর সৃজনীশক্তির প্রাণদায়িনী ধারায় অভিসিক্ত করেন নি রামমোহন। কিন্তু শুধু সৃষ্টির বহুমুখী ধারাগুলির তথ্য সংগ্রহ করলেই তো আর রামমোহনকে জানা শেষ হয়ে যায় না। এগুলি শুধু তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক তাঁর অসাধারণ মনীষার সাক্ষীস্বরূপ। তাই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের এই তথ্যগুলি একটি বিশেষ জীবন-তত্ত্বের রঙে অনুরঞ্জিত কি না সেই-টেই আমাদের জানা দরকার। সেই জীবন-তত্ত্বের নির্ধারণেই ব্যক্তির সত্তার যথার্থ পরিচয় লাভ ঘটে। তাই রামমোহনকে বুঝতে হলে রামমোহনের সত্তার উপাদান গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা একান্ত দরকার। শুধু কর্মের ধারাগুলি জানলে আসল জানার অনেকটা বাকি থেকে যায়।

রামমোহন ছিলেন বিশ্বাত্মবাদী। কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের চৌহদ্দির মধ্যে তিনি আপনাকে নির্বাসিত করেন নি। পৃথিবীর প্রধান ধর্ম-সাধনাগুলির সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিলো অসাধারণ। তিনিই এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ধর্মগুলির তুলনামূলক অনুসন্ধিৎসার সূত্রপাত করেন। বিভিন্ন ধর্মের মূল সত্যগুলি নিরূপন করে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের সমন্বয়সাধনের প্রথম প্রচেষ্টা, সে তাঁরই। কিন্তু এই সমন্বয় সাধন ধর্মগুলির ছেঁড়া টুকুরো জুড়ে ধর্মের পাঁচ-মিশলি কাঁথা সেলাই করার নামান্তর নয়। একে সমন্বয়সাধন বলে না, এ হচ্ছে জোড়া-তালি দেওয়া সমুচ্চয়-সাধন eclecticism। প্রত্যেক ধর্মের মূল সত্যগুলির সংগে অন্যধর্মের মূল সত্যের ঐক্য স্থাপনেতেই সমন্বয়-সাধনের পরিচয়। এইটেই রামমোহন করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায় ঃ—

"It is only necessary to add that not only did he include Hindu, Moslem and Christian theists in one theistic fraternity as brothers in faith; he extended this fellowship and co-operation to those, who by whatever name, would acknowledge some Principle of the Universe, the need of meditation on that Principle as good,

and the love and service of Man as the guiding principle of the conduct of life. Buddhists and Jainas and believers in a Law of Nature, he would therefore, acknowledge as not against the theistic fraternity, but with it..... It is not, therefore, necessary to assume that the great historic religions, these national embodiments of universalism, will cease or be merged one in another, apart from the question of the historic fusions of the nations themselves. From the Raja's point of view, therefore, the evolution of internationality, super-nationality, or even the Universal State, does not necessary mean that differences or variations of nationality will cease to exist, and it is not at all necessary that any of the historic religions will merge in another. But each of the great national or historic religions will grow fuller and fuller by mutual contact and assimilation, as well as by ideal convergence; they will grow, however, along their own lines of historic continuity as specific embodiments of a common Universal Regulation, even as the different ethnic types or nationalities will go on evolving as specific embodiments of Universal Humanity in specific natural and historical environments".

(Rammohun Roy: The Universal Man).

রামমোহনের এই সমন্বয়-সাধন যেমন একদিকে এর-থেকে নেওয়া-ওর-থেকে-নেওয়া তালি-দেওয়া কাঁথা নয়, তেমনি অন্যদিকে একটি ধর্মের সমস্ত আচার, সংস্কার ও রীতি নির্বিচারে গ্রহণ করে নেওয়াও নয়। এই নির্বিচারে গ্রহণের পথ ছিলো রামকৃষ্ণ পরমহংসের পথ। এই বিভিন্নমুখী পথ দুটির নাম ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায় Syntheticism and Syncretism রামমোহনের পথ হচ্ছে Syntheticism এর পথ, আর রামকৃষ্ণ পরমহংসের পথ হচ্ছে Syncretism এর পথ।

রামমোহন প্রতিটি ধর্মের মূল সত্যটিকে ছাঁট-কাট করে নেন নি, কিন্তু তাই বলে যে সব আচার ও সংস্কার সেই মূল সত্যটিকে আচ্ছাদিত করেছে সেগুলিকে তিনি স্বীকার করেন নি গ্রহণ করেন নি। যুগযুগসঞ্চিত আচার ও সংস্কার গুলিকে তিনি বর্জন করেছেন। তিনি সাময়িককে বাদ দিয়ে প্রতিটি ধর্মের শাশ্বতকে নিয়েছেন। শাশ্বতের ক্ষেত্রে মিলনই হচ্ছে সমন্বয় সাধন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র সমন্বয়-সাধক হচ্ছেন রামমোহন। রামকৃষ্ণ পরমহংস পরম উদার, ধর্মব্যাকুল মহান ব্যক্তি কিন্তু তাঁর সেই ভগবৎ-পিপাসাকে কিম্বা যে উপায়ে তিনি খৃষ্টধর্মসাধনা ও ইস্‌লামধর্মসাধনা করেছিলেন তাকে সমন্বয়সাধনা বল্‌লে ভুল বলা হবে।

মূলগত সত্যের ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্মের মধ্যে ঐক্য আছে আর সেই ঐক্যকে সকলের সামনে উদ্ঘাটিত করে ধরলে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে সেই বিরোধ দূর হবে এই নিঃসংশয় প্রত্যয় রামমোহনের ছিলো আর এই ঐক্যসাধনাই তিনি তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। কোনো এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় গঠন করা ও সেই সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রয়োজন সাধনের জন্যে সমাজ স্থাপন করার বাসনা রামমোহনের ধর্ম-সাধনার ধারণায় কোনো দিনও স্থান পায় নি।

১৭৭৬ শকের এগারোই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে অক্ষয়কুমার দত্ত যে ভাষণ দেন তাতে বলেন ঃ—"শুনা গিয়াছে, তিনি জীবদ্দশায় বন্ধুবিশেষকে কহিয়া

ছিলেন, আমার মৃত্যুর পরে হিন্দু, মোসলমান ও খৃষ্টীয় তিন সম্প্রদায়েই আমাকে স্ব স্ব শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রত্যয় যাইবে, কিন্তু আমি কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।"

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা — ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক)

ঐ ভাষণেই অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহন সম্বন্ধে বলেন ঃ— "তিনি যে সর্বশাস্ত্রের সার-গ্রাহী, নিরবচ্ছিন্ন যুক্তিপথাবলম্বী একেশ্বরবাদী ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডীড্ নামক লেখ্য পত্র তাহার সাক্ষী দিয়াছে। ..... তিনি ঐ লেখ্যপত্রে এই রূপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, **সকল দেশীয় সকল জাতীয় সকল প্রকার লোকেই এই সমাজে অধিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বস্রষ্টা, নিত্য নির্বিকার অপরিজ্ঞেয়স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন।"**

ব্রাহ্মসমাজের যে সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে অক্ষয়কুমার দত্ত এই ভাষণ দেন সেই অনুষ্ঠানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ উপস্থিত ছিলেন ও উভয়েই ভাষণ দেন। অক্ষয়কুমার অবিশ্যি তাঁর ভাষণে এই ট্রাষ্ট ডিড্‌টিকে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডিড্ বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু সেটি শুদ্ধ এই কারণে যে তিনি যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এসে যোগ দেন তখন ব্রহ্মসভার স্থান দখল করেছে ব্রাহ্ম সমাজ। তাই রামমোহনের ব্রহ্মসভার ট্রাষ্ট ডিড্‌টিকে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডিড্ বলেছেন তিনি। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে এই ট্রাষ্ট্ ডিড্‌কে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডিড্ বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কেন নয়, তা যথাস্থানে আলোচনা করবো। আপাতত শুধু এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে রামমোহন নিজেকে কোনো একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করতেন না, আর অক্ষয়কুমার দত্তের মতে রামমোহন যে প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিলেন, যার ট্রাষ্ট ডিড্‌কে অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট ডিড্ বলেছেন, আসলে কিন্তু যেটি ব্রহ্মসভার ট্রাষ্ট ডিড্ ছিলো, সেই প্রতিষ্ঠানে রামমোহনের নির্দেশ অনুসারে "সকল দেশীয় সকল জাতীয় সকল প্রকার লোকেই এই সমাজে অধিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা নিত্য নির্বিকার অপরিজ্ঞেয় স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন।" যে প্রতিষ্ঠানে সকল দেশের ও সকল জাতির লোকেরা এসে নির্বিকার অপরিজ্ঞেয় স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করতে পারবেন বলে প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেন, সেই প্রতিষ্ঠান কি একটি বিশেষ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হতে পারে ?

তাছাড়া এটা যে শুধু প্রতিষ্ঠাতার অভিপ্রায় ও নির্দেশ হয়েই থেকে গিয়েছিল, বাস্তবে কার্যকরী হয় নি তাও নয়। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে অক্ষয়কুমার দত্ত যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণেই তিনি বলেছেন ঃ—"তাঁহার (অর্থাৎ রামমোহনের — লেখক) সময়ে যেমন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য মহাশয়েরা উপনিষদাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের আবৃত্তি ও অর্থাদি করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন, সেইরূপ আবার **হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয়েরাও কখন কখন ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় ভাষায় স্তুতিপাঠ করিয়া জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতেন।"** (তত্ত্ববোধনী পত্রিকা — ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক)

এটা যদি ব্রাহ্ম নামধেয় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হোতো তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকেরা এসে নিশ্চয়ই তাঁদের ধর্মমতানুযায়ী ভগবৎ উপাসনা করতে পারতেন না। অক্ষয়কুমার দত্তের এই ভাষণই আমাদের একমাত্র নজির নয়। এই ভাষণের সাত বৎসর আগে ১৭৬৯ শকের আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নিয়ে একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ বের হয়। সেই প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকার এই তথ্যটি পরিবেশন করেছেন ঃ—"১৭৫০ শকে ভাদ্রমাসে যোড়া-সাঁকোস্থিত শ্রীযুক্ত কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎকালে প্রতি শনিবার

দায়ংকালে সমাজ হইত. তাহাতে প্রথমত দুইজন তৈলাঙ্গ ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন, তদনন্তর শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান করিতেন, পরিশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজের কাজ সম্পন্ন হইত। কলিকাতাস্থ অনেকেই তথায় আগমন করিতেন। তৎকালে তারাচাঁদ চক্রবর্তী সমাজের নির্বাহক ছিলেন। পরন্তু সমাজের আয় বৃদ্ধি হইলে কলিকাতাস্থ বর্তমান ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রস্তুত হইলে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ দিবসে তথায় উপাসনা আরম্ভ হইল। **এই স্থানে মধ্যে মধ্যে দিবাবসান কালে মোছলমান্ ও ফিরিঙ্গী বালকেরা পারসীক ও ইংরাজী ভাষাতে পরমেশ্বরের স্তবগান করিত।**" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আশ্বিন, ১৭৬৯ শক, প্রথম ভাগ, পঞ্চম সংখ্যা) দেখা যাচ্ছে যে ১৭৫০ শকে কমলবসুর বাড়িতে যে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হোলো, ১৭৬৯ শকে এই প্রবন্ধকার তাকেই ব্রাহ্মসমাজ বলে অভিহিত করেছেন, যেহেতু ১৭৫০ শকে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা ১৭৬৯ শকে ব্রাহ্মসমাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে নামে ও কাজে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৭৫১ শকে যখন এই ব্রহ্মসভা তার নিজের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হল তখন মুসলমান ও ফিরিঙ্গীরা মধ্যে মধ্যে তাঁদের নিজেদের ভাষায় পরমেশ্বরের স্তবগান করছেন সেই সভা-গৃহে। এর থেকেই সুস্পষ্ট হচ্ছে যে যখন রামমোহন এই ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাকে শুধু হিন্দু একেশ্বরবাদীদের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি আদৌই কল্পনা করেন নি। তিনি যতোদিন ভারতবর্ষে ছিলেন ততো দিন এই ব্রহ্মসভা নামে ও কাজে সব ধর্মের একেশ্বরবাদীদের মহামিলন ক্ষেত্র ছিলো। তাঁর এই উদ্দেশ্য ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে ব্রহ্মসভার যে ট্রাস্টীডিড্ তাতে সুস্পষ্ট করে তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন যে ট্রাস্টীরা—"shall at all times, permit the same building, land, tenements, hereditaments, and premises, with their appurtenances, to be used, occupied, enjoyed, applied, and appropriated, as, and for a place of Public Meeting, *of all sorts and descriptions of people without distinction*, as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious, and devout manner, for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable, and Immutable Being, who is the Author and Preserver of the Universe, but not under, or by any other name, designation, or title, peculiarly used for and applied to any particular Being or Beings, by any man or set of men whatsoever; and that no graven image, statue, or sculpture, carving, painting, picture, portrait or the likeness of anything, shall be admitted within the messuage, building etc., and that no sacrifice, offering, or oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein;.....and that in conducting the same worship and adoration, no object animate or inanimate that has been or is, or shall hereafter become, or be recognised as an object of worship by any man, or set of men, shall be reviled, or slightingly or contemptuously spoken of, or alluded to, either in preaching, praying, or in the hymns, or other mode of worship that may be delivered, made or used in such worship, but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue, and *strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds etc., etc.*".

ট্রাস্ট্ ডিডের উদ্ধৃত অংশ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে চিৎপুর রোডের ব্রহ্মসভার নব-নির্মিত ভবন রামমোহনের ধারণা অনুযায়ী "to be used, occupied, enjoyed, applied, and appropriated, as, and for a place of Public Meeting, of all sorts and descriptions of people without distinction এবং এই ভবনে যে আরাধনা করা হবে সেটার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য "promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue, and strengthening of the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds".

ট্রাস্ট ডিডের নির্দেশ যে কোন রকম বাদবিচার করা চলবে না, সকল ধর্মের একেশ্বরবাদীরা এই ভবনটিকে তাদের মিলনস্থান রূপে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই ভবনে যে আরাধনা হবে সেটির উদ্দেশ্য হবে উদারতা, নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করা ধার্মিকতা ও মানবপ্রেম উদ্বুদ্ধ করা এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মিলনকে সুদৃঢ় করা। এগুলিকে কি একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রয়াস বলে ধরে নেওয়া সম্ভব? একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্যে এই ভবনটিকে ব্যবহার করা রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিলো, এ কথা কি এর পরেও বলা যায়? রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে আদি ব্রাহ্ম সমাজের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"আদি ব্রাহ্ম সমাজ কেবল মাত্র উপাসনার স্থান, যে খুসি এসো উপাসনা করিয়া চলিয়া যাও। রামমোহন রায়ের ট্রাষ্ট ডিড অনুসারে উহা কোন দস্তুর মোতাবেক সভায় পরিণত হইতে পারে না।" (রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত)

রাজনারায়ণ বসু ঠিক কথাই বলেছেন। রামমোহনের মত ও এই ট্রাস্ট ডিড্ অনুসারে যে ভবনটিকে রাজনারায়ণ আদিব্রাহ্ম সমাজ বলেছেন সেখানে যে খুসি (তাকে অবিশ্যি একেশ্বরবাদী হতে হবে) এসে উপাসনা করতে পারবে। এটা একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে পারবে না।

এতোক্ষণ পর্যন্ত আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলুম সেটি হচ্ছে রামমোহনের জীবনের মূল সুর সম্বন্ধে আলোচনা। সেই সুর ছিলো সমন্বয় সাধনের সুর, বিশ্বাত্মবাদের সুর। একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি করবার কোনো উদ্দেশ্য রামমোহনের কখনো ছিলো না। সব ধর্মের মূল সত্যগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব ও সেই সমন্বয় সাধন করতে হবে। অবিশ্যি প্রজ্ঞার দ্বারা সেই ঐক্য স্থাপন করতে হবে, সব কিছু নির্বিচারে গ্রহণের দ্বারা নয়। বিশ্বমানবের মধ্যে সব বিরোধ দূর করে বিশ্বমানবের মহামিলন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এই ছিলো রামমোহনের জীবনের মূল আদর্শ। এতো বড়ো আদর্শ নিয়ে কোনো মানুষ অষ্টাদশ কিম্বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে দেখা দেন নি। তবুও কি আমরা আমাদের অজ্ঞানতার দরুণ কিম্বা সাম্প্রদায়িক মনের সংকীর্ণতার দাবীতে মহা-সমুদ্রের মতো বিশাল এই মানুষটিকে খিড়কির পুকুর বলে জাহির করবো, হিমাদ্রি-শিখরের মতো মহান এই পুরুষকে উইয়ের ঢিপি বলে প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে লেগে থাকবো?

তিনি ব্রহ্মসভা স্থাপন করলেন সবধর্মের একেশ্বরবাদীদের মিলন-ক্ষেত্র স্বরূপ আর আমরা কি তাঁকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনের জন্যে একটি সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলে জাহির করে তাঁকে খর্ব করবো? এর চেয়ে পরিতাপের কথা আর কিছু হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"তিনি সমাজ-প্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরাণ পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সার সংগ্রহ করিতেছেন, আড্যাম সাহেবকে দলে টানিয়া

ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন। (আত্মপরিচয়—পরিচয়)

বিপিনচন্দ্র পাল লিখ্‌ছেন—"হিন্দু,মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের চিন্তানায়ক এবং উদার সাধকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাহাতে একে অন্যের ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের ও কল্যাণের সন্ধান পাইতে পারেন এবং এই সন্ধান পাইয়া একে অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন, ইহাই রাজার 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়াই মনে হয়।" (যুগ-প্রবর্তক রামমোহন)

বিপিনচন্দ্র আবার বল্‌ছেন ঃ—"সেই মহামিলন ক্ষেত্রের পথ গড়িয়া তুলিবার আশাতেই রাজা 'ব্রহ্মসভার' প্রতিষ্ঠা করেন।" (যুগপ্রবর্তক রামমোহন)

সেই একই প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র বল্‌ছেন ঃ—"রাজা ব্রাহ্মধর্ম নামে কোনও নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ব্রাহ্মসমাজ নামে কোনও সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন নাই।" (যুগপ্রবর্তক রামমোহন)

রবীন্দ্রনাথের ও বিপিনচন্দ্রের যে মতামতগুলি উদ্ধৃত করেছি সেগুলিকে আমি রাম-মোহন যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন নি, ব্রহ্মসভা স্থাপন করেছিলেন, তার নজির স্বরূপ পেশ করি নি, যদিও এঁদের দুজনের মন্তব্য থেকে সেটিও পরিস্ফুট হচ্ছে। রামমোহনের অন্ত-র্লোকের বিস্তৃতি, গভীরতা ও রূপ যাঁরা খুব ভালো ভাবে দেখেছেন, এমন দুটি দক্ষ মানস-জরীপদারদের রামমোহনের জীবন-আদর্শ সম্বন্ধে কি অভিমত সেইটি দেখাবার জন্যে রবীন্দ্র-নাথের ও বিপিনচন্দ্রের মত উদ্ধৃত করেছি। অর্থাৎ কিনা ঐতিহাসিক তথ্যের প্রমাণ হিসেবে নয়, মানস-তত্ত্বের নজির হিসেবে তাদের হাজির করেছি।

কিন্তু মানস-তত্ত্ববিদদের মনের জরিপের খবর দিয়ে তো আর ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যা-সত্য বিচার করা যায় না। আর একটি ব্যক্তির মানসের সঙ্গে তার কর্মের সম্বন্ধ স্থাপন করা অর্থাৎ কিনা তার মানস পরীক্ষা করে বলা যে এ কর্ম তার পক্ষে সম্ভব, আর এই কর্ম তার পক্ষে সম্ভব নয়—এটা মনোবিজ্ঞানসম্মত হলেও নিছক্ তথ্যবাদীদের কাছে এর কোনো কদর নেই। তাঁরা বল্‌বেন, রামমোহনের মানস সম্বন্ধে যিনি যাই বলুন না কেন তিনি যে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেছিলেন এটা ঐতিহাসিক তথ্য। আর তার প্রমাণ স্বরূপ এক, দুই, তিন করে গুণে তারা যুক্তি দিয়েছে। এখন সেই যুক্তিগুলো একটি একটি করে বিচার করে দেখা যাক। যাক।

প্রথম যুক্তি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে মিঃ বেটিংককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার জন্যে যে জনসভা আহ্বান করা হয় তার বিজ্ঞপ্তি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ও ১০ই নভেম্বরের 'সমাচার দর্পণ'-এ ছাপা হয়। সেই বিজ্ঞপ্তিতে **'ব্রাহ্মসমাজ গৃহে'** কথাটির উল্লেখ আছে। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় এই সভার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই বিবরণটি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-এ ছাপা হয়। তাতে ব্রাহ্মসমাজ কথাটির উল্লেখ আছে। 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় উক্ত সভার যে বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়, 'সংবাদ কৌমুদী' থেকে নেওয়া সেই বিবরণটি ১৮৩২ খৃঃ ২৪শে নভেম্বর তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-এ ছাপা হয়। তাতেও **ব্রাহ্মসমাজ গৃহের** কথার উল্লেখ আছে।

এই তথ্যগুলি নির্ভুল; শুধু ৬ই নভেম্বর 'সমাচার দর্পণ' নেই, কেন না 'সমাচার দর্পণ' সপ্তাহে দুদিন ছাপা হোতো; বুধবার আর শনিবার। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর ছিলো মঙ্গলবার। তাই ৭ই নভেম্বর, বুধবারে 'সমাচার দর্পণ' দস্তুর মোতাবেক বার হয়েছিল, ৬ই নভেম্বরে নয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ নিম্ন-লিখিত

বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয় ঃ—"স্ত্রীদাহনিষেধবিষয়ক বিজ্ঞাপন

শ্রীল শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাদ্যধিপতি গত জুলাই মাসের একাদশ দিবস বুধবারে প্রবি-কৌন্সলে হিন্দুরদের স্ত্রীদাহবিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বরের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং এদেশের কএক জন হিন্দু যে পুনরায় স্ত্রীদাহ হয় এজন্য আবে-দন লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই এ জন্য স্ত্রীদাহ নিবারণের অনুরাগিরা শ্রীল শ্রীযুতের উপকার স্বীকারের কি কর্ত্তব্যকর্ত্তব্য বিবেচনা জন্য ভবিষ্যৎ শনিবার ২৬ কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর দুই প্রহর ছয় ঘণ্টা দিবার সময়ে যোড়াসাঁকোর **ব্রাহ্মসমাজ গৃহে** একত্র হইবেন অতএব এই আহ্বান লিপি প্রকাশে জানাইতেছি যে যাঁহারা স্ত্রীদাহ নিবারণে অনুরাগ করেন তাঁহারা উক্ত সময়ে ও দিবসে সাধারণ গৃহ **ব্রাহ্মসমাজে** আগমন করিবেন। ইতি ১২২৯ সাল ২২ কার্ত্তিক

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ রায়
শ্রী রমানাথ ঠাকুর
শ্রী রাধাপ্রসাদ রায়
টরণ্টীস"

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা থেকে নেওয়া দশই নভেম্বর তারিখের জনসভার এই ছোট্ট খবরটি ছাপা হয় ঃ—

"স্ত্রীদাহ নিবারণে হর্ষসূচক সভা

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে **ব্রাহ্মসমাজের** সাধারণ গৃহে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক মনোরম কমিটি করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ সভোপবিষ্ট ইয়োরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মাহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম প্রশ্ন এই হইয়াছিল যে অত্যধিক ঘৃণ্য স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর্ম নিবারণ প্রযুক্ত আমারদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সম্প্রতি ইঙ্গলণ্ড হইতে আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহ্লাদিত করিয়াছে ইত্যাদি।"

এর সঙ্গে আমি আর একটি সাক্ষ্য জুড়ে দিই যেটি — রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত **ব্রাহ্মসমাজ-এই** মতাবলম্বীদের কাজে আসবে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মন্তব্য করা হয়েছে ঃ—

"এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র হইতে নীত লিপির মধ্যে **ব্রাহ্ম্য সমাজ গৃহে** গত শনিবারের সভার বৃত্তান্ত দৃষ্ট হইতে পারে। শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদশাহ ও তাঁহার মন্ত্রিগণ এবং কোর্ট অফ ডৈরক্টর্স এবং শ্রীযুক্ত লার্ড উইলিয়ম বেন্টীঙ্ক ও রাজা রামমোহন রায় সতীরীতি রহিত করণার্থ যে বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত উক্ত সভাতে তাঁহারদের প্রতি বিশেষ বিশেষ প্রশংসাপত্র প্রেরণ করিতে অনুমতি হইয়াছে ইত্যাদি।"

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকা থেকে নেওয়া এই খবরটি ছাপা হয় ঃ— "স্ত্রীদাহনিষেধ বিষয়ক সভা

অস্মাদাদির দেশের স্ত্রীপরমপরা মৃত পতি সহ দগ্ধ হইতেন এই ব্যবহার ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিবারিত হইবাতে এবং ইঙ্গলণ্ডে সেই নিয়ম শ্রীল শ্রীযুত কিং ইন প্রিবি কৌন্সলে গ্রাহ্য করিবাতে তাহাকে ধন্যবাদপত্র প্রদত্ত করিতে হইবেক এই বিবেচনা করিবার জন্য বিজ্ঞান লিপির অনুযায়িক গত শণিবার সন্ধ্যাকালে যোড়াসাঁকোর **ব্রাহ্মসমাজে** তথাকার টরণ্টীদের সম্মতিতে স্ত্রীদাহ নিবারণের অনুরাগি হিন্দুরা এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আরো তিনটি নজীর আমি এর সঙ্গে জুড়ে দিই। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মন্তব্য করা হয় ঃ—

"ব্রাহ্মসমাজের সভা

ব্রাহ্মসমাজ গৃহে শেষ সভার বৃত্তান্ত জ্ঞানান্বেষণ পত্রে প্রকাশ হইলে দর্পণে তাহা আমরা অবিকল অর্পণ করিয়া বোধ করিলাম যে তাহার আর অধিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করণের প্রয়োজন হইবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।"

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখের **'সমাচার দর্পণ'-এ** এই খবর ছাপা হয় ঃ—

"কটকের চাঁদাপত্র

ব্রাহ্মসমাজ ১০ নভেম্বর ১৮৩২

শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৫০

শ্রীযুত কালীনাথ রায় ৫০

শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুর.....৫০ ইত্যাদি ইত্যাদি"

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত এই খবরটি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত হয় ঃ—

ব্রাহ্মসমাজ

১৩ই জুলাই তারিখে **ব্রাহ্মসমাজের** যে সভা হইয়াছিল জান বুল পত্রে তাহার যথার্থ বিবরণ প্রকাশ হওয়াতে চন্দ্রিকাকার অসহিষ্ণু হইয়া তৎসম্পাদকের প্রতি লিখিয়াছেন যে "আমরা বিশেষানুসন্ধান পূর্বক প্রকাশ করিতেছি ঐ সভায় যে কএক লোকের আগমন হইয়া থাকে তদতিরেক আর হয় নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।"

প্রমাণের তালিকা এতো দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন যে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা না করে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আদবেই প্রমাণ করা গেলো না। যতগুলি প্রমাণ উপরে ধরে দেওয়া গেলো সবগুলিই হচ্ছে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের নজির। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিলো না, এ কথা কে কবে বলেছে? আমার মতে রামমোহন ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন নি। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি রামমোহন এদেশ থেকে চিরদিনের মতো চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পরে ব্রহ্মসভা ব্রাহ্মসমাজের নাম ও রূপ গ্রহণ করেছে। যাঁরা রামমোহনকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রমাণ করতে চান তাঁদের দেখাতে হবে যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মসভা কমল বসুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হোলো তখন থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি পর্যন্ত অর্থাৎ রামমোহনের দেশত্যাগের সময় পর্যন্ত, এই দুই বৎসর কালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিলো। যাঁরা এটা দেখাতে পারবেন তাঁরা নিঃসন্দেহে রামমোহনকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রমাণ করতে পারবেন। কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্রের নজির টেনে রামমোহনকে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রমাণ করবার চেষ্টা ইচ্ছার খাতে ইতিহাসের ধারাকে জোর করে বইয়ে দেওয়ার চেষ্টার সামিল।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত সে সময়ের কোনো সংবাদপত্রে 'ব্রাহ্ম-সমাজ' এই কথাটির উল্লেখ মাত্র নেই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখের রাম-মোহন-কৃত ট্রাস্ট ডি ডের নজির দিয়ে কেউ কেউ বলে থাকেন যে এই ট্রাস্ট ডিড্‌টি ব্রাহ্ম-সমাজের ট্রাস্ট ডিড্, কেন না তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট ডিড্ বলে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এর উত্তরে এইটুকু দেখালেই যথেষ্ট হবে যে ট্রাস্ট ডিডের কোথাও 'ব্রাহ্ম-সমাজ' এই কথাটির নামগন্ধ নেই। আর ১৭৭২ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় ট্রাস্ট ডিড্‌টিকে 'ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্ট ডিড্' এই শিরোনামা দিয়ে ছাপা হয়েছিলো বটে কিন্তু এই সামান্য তথ্যটুকু মনে রাখলে অনর্থক হয়রাণি থেকে বেঁচে যাওয়া যাবে যে ট্রাস্ট ডিড্‌টি করা হয় ১৭৫২ শকে আর তার বিশ বৎসর বাদে ওটাকে 'ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট ডিড্' বলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় ছাপানো হয়। অনন্তকালের পটভূমিকায় কি কেউ কোনো দিন কোন জিনিসের উৎপত্তির কাল নির্ণয় করেছে? কাহিনী এ ভাবে রচিত হতে পারে, কিন্তু ইতিহাস কখনো এতোটা বেপরোয়াভাবে রচিত হয় না।

এবার ট্রাস্ট ডিড্‌টি নিষ্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সংবাদপত্রগুলিতে কি খবর বের হয়েছিলো সেটি দেখা যাক। তারপরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেকালের সংবাদ পত্রগুলিতে কি সব খবর বের হয়েছিলো সেগুলি দেখে নেওয়া যাবে। আমরা আগেই দেখেছি যে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে ট্রাস্ট ডিড্‌টি সম্পন্ন হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদ কৌমুদীতে এই চিঠিটি প্রকাশিত হয় ঃ—

To the Editor of the Cowmoodee

How shall I describe the extent of the knowledge which the Editor of the Chandrika has attained.....His censuring the employment of Moosoolman music to assist the singing after the reading of the Vedas, reminds me of the couplet of the Mahabharut, "O king, he sees the fault of another, though it be no longer than a grain of mustard seed; he overlooks his own, though it be larger than a Vilva fruit". This couplet is brought to my mind by the fact that the Chandrika sees no propriety in employing Moosoolman music and dancing, and in giving the English wine and meat at the Doorga, Ras and other festivals.... .....How astonishing is it that he should see no fault in anything but in the *Brahma Sabha !*

A Reader of Chandrika

Feb. 15, 1830.

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের জন্ বুল্ পত্রিকায় সমাচার দর্পন থেকে এই মন্তব্যটুকু উদ্ধৃত করা হয় ঃ—

We have this week extracted two articles from the Chundrika, and the Coumudy. The Chundrika advocates the Dhurma Subha, the Coumudy, the Brumhu Subha. It is not our intention to enter into the merits of the question at issue between them, but we shall impartially insert in the Durpun the most important articles from both papers.

Samachar Durpun

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-এ 'জাতির কর্তৃত্ব বিষয়' শীর্ষক এই মন্তব্যটি ছাপা হয় ঃ— "তিনি (সমাচার দর্পণ-প্রকাশক—লেখক) বিবেচনা পূর্বক সুবিচার করিয়া ধর্মসভাকে জাতির কর্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন ইহা আমরা সপ্রমাণ করিব। যদি বল ইহার কি প্রমাণ? উত্তর এক প্রমাণ দেখ এই নগরে **ব্রহ্মসভা** নামে একটি সভা আছে তাহার

অধ্যক্ষ শ্রীযুত রামমোহন রায়। এক্ষণে তৎপদে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় নিযুক্ত আছেন এবং তথায় শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পাণ্ডিত্য কর্মে অভিষিক্ত এবং শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুন্সী সেই সভার মতাবলম্বী। এবম্প্রকারে তত্ত্ব করিলে ঐ সভা সংক্রান্ত আর দুই চারিজন খ্যাত লোক পাওয়া যাইতে পারে। দর্পণ প্রকাশক মহাশয় তাঁহার দিগকে প্রশ্ন কেন না করিলেন।"

এর উত্তরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখের সমাচার দর্পণ-এ দর্পণ সম্পাদক এই মন্তব্য করেন ঃ— "পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক স্মরণ করুন যে ভারতবর্ষে জাতির হানিতে পৈতৃক সম্পত্তির হানি হয় এতদ্বিষয়ে শ্রীযুত ফারগিসন সাহেব হৌস অফ কমন্সে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া ঐ প্রস্তাবে আমারদিগের সূক্ষ্মানুসন্ধানাকাঙ্খা হওয়াতে ধর্ম-সভাকে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ..... ইহাতে তৎ সভাসম্পাদক চন্দ্রিকা-প্রকাশক মহাশয় কহেন যে আমরা ঐ সভার জাতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছি। ফলিতার্থ এই যে ঐ সভাতে অনেক হিন্দুধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন এই বোধে আমারদের উক্ত সভায় তদ্বিষয়ক প্রশ্নকরণমাত্র অভিপ্রায়। ডাক্তার উইলসন বা ডাক্তার কেরী বা **ব্রহ্মসভাস্থঃপাতি** পণ্ডিতেরাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও হইত কিন্তু তাহা করিলে কোন বালকেও এমত বুঝিত না যে ঐ উক্ত সাহেব প্রভৃতিকে জাতির কর্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়। "

সমাচার চন্দ্রিকা-প্রকাশক এর যে উত্তরটি দেন সেটি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ ছাপা হয় ঃ—"তিনি (সমাচার দর্পণ-প্রকাশক—লেখক) ধর্মসভাকে যে জাতির কর্তা কহিয়াছেন ইহা তাঁহারি লেখা দ্বারা পুনঃ পুনঃ সপ্রমাণ হইতেছে যে হেতু প্রাগুক্ত কথা বিবেচনা করিলে কে না বুঝিতে পারিবেন কেন না তিনি কহেন। ডাক্তার উইলসন বা ডাক্তার কেরী সাহেব অথবা **ব্রহ্মসভাকে** জিজ্ঞাসা করিলে কি তাঁহারদিগকে জাতির কর্তা স্বীকার করা হইত অর্থাৎ হইত না কেন না অসম্ভব কখন হয় না।"

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার মুজাপুরনিবাসী কৃষ্ণমোহন দাস সম্পাদিত 'তিমির নাশক' পত্রিকায় ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে এই বিবরণ ছাপা হয় ঃ— "কয়েক বৎসর হইল এ মহানগর কলিকাতার যোড়াসাঁকো স্থানে **ব্রহ্মসভা** নামক এক সভা স্থাপন হইয়াছে ইহাতে প্রতি শনিবার সায়ং সময়ে বেদপাঠ ও ভাষা ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মবিষয়ক গান হইয়া থাকে। ঐ সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা তদর্থে এক অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন তদুপরি বিষয়ি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শ্রবণেচ্ছুক হইয়া প্রতি সৌরি বাসরেই গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় তাঁহারা বহু সম্মানও প্রাপ্ত হন। বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা পত্র দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করণান্তর তৎ সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরা বহু ধনদান ও সম্মান করিয়া তাঁহারদিগকে বিদায় করেন এতাদৃশ নিয়ম করিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত সময়েও তৎসভায় দান বিতরণ হইয়া থকে। সম্প্রতি ১৯ ভাদ্র শনিবার ঐ সভায় ন্যূনাতিরেক ২০০ দুই শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পত্র-দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু ছাত্রেরা সমাগম হইয়াছিল। অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পত্রানুসারে ১৬। ১২। ১০। ৮। ৬। ৫। ৪। ৩। ২ তঙ্কা করিয়া দান করিয়াছেন।"

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সুবিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'রিফর্মার' পত্রিকায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই খবরটি বের হয় —

"The *'Bramho' Sabha* a Vedant institution was established in the year 1828, by our enlightened and celebrated countryman Babu Rammohun Roy, in conjunction with several other intelligent Hindoo, and it has ever since continued to flourish, and to bestow mental benefits on our countrymen from the rich treasure

of theological and moral instructions contained in the Vedant. Its meetings are held every Saturday evening at a well-known house in Chitpore Road, where preaching from the Vedant and singing psalms in praise of the one true God occupy the time of those who meet under the roof to worship the eternal Creator of the universe.....Christians and men of every other persuasion are permitted to be present at the religious acts that are performed within this sanctuary".

'Calcutta Monthly Journal'

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ইণ্ডিয়া গেজেট থেকে এই কথাগুলি উদ্ধৃত করে দিয়েছিলো ঃ—

"The labours of Rammohan Roy and the establishment of the Hindu College altogether contributed to give a shock to the popular system of idolatry in Calcutta, perhaps we might say in Bengal which has evidently alarmed the fears of its supporters. A *Brumha Sabha* or Hindu theistical society, has been formed by Rammohun Roy and his friends etc., etc."

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্টের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এই চিঠিটি ছাপা হয় ঃ—

"About two years and a half ago the Editor of the "Chundrika" or Secretary of the Dhurma Subha, filled the Chundrika with numerous assuarances, according to the fine inventions of his own brain, that whereever there were visits and invitations of the brahmuns and others who were the opponents of religion and adherents of the *Brumha Sabha*, the gentry of the Dhurma Sabha would not appear, and that whoever gave such invitations would be excluded from all others. .....Lately, however in a place 10 miles distant from this Metropolis, at the house of a most excellent, estimable, honoured and illustrious brahmun, the most eminent persons of both the *Brahma*, and the Dhurma Sabha, were invited on a particular occassion, and appeared together".

One impatient of injustice.

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবসারভার **ব্রহ্মসভা** সম্বন্ধে লেখে—

"This institution was planned and commenced about the year 1814. Its originator and chief supporter was Rammohun Roy, but he was joined also by Kaleesunkur Ghoshal, Brijomohun Mojumdar, Ramnursing Mukhopodhaya, and a few other highly respectable natives. The meetings were formerly held at the garden-house of Rammohun Roy, but during the last five or six years, service has been regularly conducted once a week at a house in the Chitpore Road. Three eminent Pundits are engaged to conduct the service, viz., Ramchunder, Ootsobanundo, and a Hindoostanee reader, called Bawjee. The duty of the first is, to explain the text of Vyas, Ootsobanundo explains the Upanishads, and Bawjee simply reads portions of the Vedas in the original sanskrit language. The object of the *Brahmo Sabha* is to make known that part of the Vedas which is either

unknown, forgotten or neglected.....The only thing that distinguishes the party from other religionists is, that they do not bow down to idols, but worship the one eternal, invisible spirit.

The hymns were composed by Rammohun Roy, Neelmony Ghosh, Kaleenath Roy and others. One half of the service consists in saying some of these hymns. .....The bealah resembles our violincello, and the mondeere are small cymbals, which have a very pleasing effect. These are the only instruments used in *Brumha Shubha*.

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র নবম সংস্করণে রামমোহন ও ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে এই মন্তব্য আছে ঃ—

"At last Rammohun felt able to re-embody his cherished ideal, and on August 20, 1828, he opened the first Brahma Association (*Brahma Sabha*) at a hired house".

নতুন বাড়ি তৈরী করে ব্রহ্মসভা যখন সেই নতুন বাড়িতে উঠে গেলো সেই সম্বন্ধে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বল্‌ছে —

"A suitable church-building was then erected and placed in the hands of trustees, with a small endowment and a remarkable trust-deed by which the building was set apart "for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being, who is the Author and Preserver of the universe". The new church was formerly opened on the 11th Magh (January 23), 1830, from which day the *Bramha Samaj* dates its existence".

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র মতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে যে দিন নতুন বাড়িতে ব্রহ্মসভার উদ্বোধন হোলো সেই দিন থেকে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হোলো এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র এই ধারণা ভুল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন কমল বসুর বাড়ি থেকে ব্রহ্মসভা তার নিজের বাড়িতে স্থানান্তরিত হোলো তখন থেকে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত ঘটে নি। অন্তত সে সময়ের কোনো পত্রিকায় কিম্বা কোনো বইতে তার কোনো প্রমাণ নেই। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র নবম সংস্করণে যখন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা হোলো তার অনেক দিন আগেই চিৎপুরের ব্রহ্মসভার বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ চালু হয়ে গেছে। তাই এই ভুল করে বসেছে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের হদিশ তৎকালীন ইতিহাস থেকে আমরা পাই না।

রামমোহনের শিষ্য কালীনাথ মুন্সী যখন মারা গেলেন তখন 'ফ্রেন্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা তাঁর মৃত্যুর খবর দিয়ে লিখ্‌লো —

"He was among the most devoted admirers and followers of Raja Rammohun Roy and assisted him in the establishment of the *Brahmo Sabha* etc., etc.

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে যেখানে তিনি উপনিষদের ছিন্নপত্রটি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যের কাছে তার অর্থ বোঝাবার জন্যে নিয়ে যাওয়ার কথা লিখেছেন সেখানে তিনি বল্‌ছেন —

"I hurried up to the boythakkhama on the third story, and asked Shyma-

charan Bhattacharya to explain to me what was written on the printed page. He said, "I have been trying hard all this time, but cannot make out its meaning". This astonished me. English scholars can understand every book in English language; why then cannot Sanskrit scholars understand every Sanskrit book? Who can make it out then? I asked. He said, "that is what the *Brahma Sabha*[1] talks about". (Autobiography of Marshi Debendranath Tagore. Translated from the original Bengali by Satyendranath Tagore and Indira Devi 1916).

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন— "এই বৎসরের (১৮২৮ সাল) ৬ই ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতার চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসু নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের বৈঠকখানা ভাড়া লইয়া সেখানে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — নিউ এজ সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬২ পৃষ্ঠা ৯৮)

এখানে তিনি ব্রাহ্মসমাজ কথাটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার কয়েক লাইন পরেই লিখছেন — "ব্রহ্মসভা স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিন্দু সমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল।"

কয়েক পাতা পরেই আবার পাচ্ছি ঃ— "ইহার অল্প দিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১১ই মাঘ দিবসে রামমোহন রায় তাঁহার নবনির্মিত গৃহে ব্রহ্মসভাকে স্থাপন করলেন।" তার পরের পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন — "সতীদাহ নিবারণ ও ব্রহ্ম সভা স্থাপন নিবন্ধন কলিকাতা-বাসী হিন্দুগণের মন এমন উত্তেজিত হইয়াছিল যে সতীদাহ নিবারণ-বিষয়ক আইন রদ করিবার জন্য এক আবেদন পত্রে বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর হইতে লাগিল।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — নিউ এজ সংস্করণ — ভাদ্র, ১৩৬২, পৃষ্ঠা ১০৪)

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইটি থেকে যে অংশগুলি উদ্ধৃত করেছি সেগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শাস্ত্রী মহাশয় কমল বসুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভাকে ব্রাহ্মসমাজ বলেছেন নিছক অভ্যাসবশত, কেন না তার পরেই ঐতিহাসিক নির্ভুলতার সম্বন্ধে সজাগ হয়ে তিনি তিন তিন বার ব্রহ্মসভা স্থাপনার কথা বলেছেন।

এগুলি ছাড়াও Rammohun Roy: The story of His Life প্রবন্ধে ব্রহ্ম সমাজের পত্তনের ইতিহাস বর্ণনা করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন

"The opening of the new theistic service which the common people of the time called the "*Brahma Sabha*" or the "One-God Society", once more roused the enmity of the orthodox Hindu community of Calcutta.....Since the inauguration of the "*Brahma Sabha*" on the 20th August, 1828, its services began to attract increasing numbers, and it secured new sympathisers".

শুধু সাধারণ লোকই এই একেশ্বরবাদী প্রতিষ্ঠানকে ব্রহ্ম-সভা বল্‌তেন না, সাধারণ অসাধারণ সব লোকই তখন যথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটিকে ব্রহ্ম সভা বলতেন কেননা যিনি একেশ্বরবাদী এই প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা সেই রামমোহন রায়ই একে ব্রহ্মসভা নাম দিয়েছিলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন এই মতের সমর্থকদের প্রথম যুক্তির আলোচনা করছিলুম। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি থেকে যে সব

[1] The religious association established by Rammohun Roy.

নজীর আমাদের সামনে হাজির করেছিলেন, সেগুলির বিশদ আলোচনা করেছি। সেগুলি আদৌই প্রমাণ করে না যে ব্রাহ্ম সমাজ রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেটি প্রমাণ করতে গেলে কি করা দরকার সেটি প্রথমেই বলেছি — দরকার দেখানো যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি পর্যন্ত অর্থাৎ রামমোহনের ভারতবর্ষ ত্যাগের আগে পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজ বলে কোনো প্রতিষ্ঠান ছিলো। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্রগুলির নজীর দিয়ে এটা প্রমাণ করা যায় না। এঁদের মতের সমর্থন করে এমন অন্তত কটি নজীর আমি যুগিয়ে দিয়েছি এঁদের। তারপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নানা পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকে আমরা দেখছি যে চিৎপুর রোডের একেশ্বরবাদী প্রতিষ্ঠানটি ব্রহ্মসভা নামেই সুপরিচিত ছিলো। এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ ও ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের উদ্ধৃতিগুলিই আমাদের এই আলোচনার জন্যে বিশেষ মূল্যবান। ১৮৩২ ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পত্রিকাগুলির উদ্ধৃতি এই আলোচনার মধ্যে সত্যিকার স্থান পেতে পারে না। তবুও যে হেতু রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ এই মতাবলম্বীরা শুধু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্রের উদ্ধৃতির প্রমাণ হাজির করেছেন তাই ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের একটি একটি করে উদ্ধৃতি আমি পেশ করছি।

পত্রিকার এই উদ্ধৃতিগুলির চেয়ে কম মূল্যবান নয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তিগুলি। আমার যা প্রতিপাদ্য সেটি হচ্ছে এই যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড যাত্রার কাল পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজ বলে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিলো না। তখন যে প্রতিষ্ঠানটি ছিলো সেটি হচ্ছে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-সভা। ব্রহ্মসভা ব্রাহ্ম-সমাজ হয়ে দাঁড়ায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, আর এই নাম পরিবর্তনের জন্যে দায়ী হচ্ছেন পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি শুধু নামই পরিবর্তন করেন নি তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মূল ধারণাকেও পরিবর্তিত করেছিলেন। যথা স্থানে তার আলোচনা করবো। এই গেলো রামমোহন প্রতিষ্ঠিত-ব্রাহ্মসমাজ-মতাবলম্বীদের প্রথম যুক্তির উত্তর।

এবারে তাঁদের দ্বিতীয় যুক্তিটির আলোচনা করা যাক।

দ্বিতীয় যুক্তি — ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কমল লোচন বসুর বাড়ি ভাড়া করে যখন ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হোলো তখন সেই ব্রহ্মসভাতে প্রতি সপ্তাহে প্রথমে বুধবার, বুধবার, তারপরে শনিবার শনিবার পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের ব্যাখ্যান প্রদান করতেন। সেই ব্যাখ্যানগুলি পরে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। তার আখ্যানপত্রে মুদ্রিত আছে—শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্ম কর্তৃক। ব্রাহ্ম সমাজ। কলিকাতা। বুধবার ৬ই ভাদ্র শকাব্দা ১৭৫০। অতএব রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত-ব্রাহ্মসমাজ-মতাবলম্বীদের মতে এর থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে ১৮৫০ শকাব্দে (১৮২৮ খৃষ্টাব্দ) রামমোহন রায়ের উপস্থিতিতেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বীকার করতেই হবে যে এই দ্বিতীয় যুক্তিটি খুব জোরালো যুক্তি। এটা যদি প্রমাণিত হয় যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কমললোচন বসুর বাড়িতে যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তার নাম ছিলো ব্রাহ্মসমাজ, তাহোলে বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তাহোলে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কথা মানা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। আর যে প্রমাণ তাঁরা উপস্থিত করেছেন সে প্রমাণ খুবই জবরদস্ত প্রমাণ। কমল বসুর বাড়িতে যে সাপ্তাহিক সভা বসতো, প্রথমে বুধবার বুধবার, পরে শনিবার শনিবার, সেই সভাতে যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে ধর্মীয় উপদেশ দিতেন আর প্রত্যেকটি বক্তৃতা পরে পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। আর প্রত্যেকটি পুস্তিকার

উপরেই 'ব্রাহ্মসমাজ' কথাটি মুদ্রিত আছে। আর দিন ও তারিখ প্রতিটি পুস্তিকার উপর লেখা আছে। তাই সন্দেহের অবকাশ নেই, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকেই ব্রাহ্মসমাজ চলে আসছে, রামমোহনই এর প্রষ্টা। এখন এই যুক্তির সমর্থনে যে প্রমাণটি হাজির করেছেন রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত-ব্রাহ্মসমাজ-মতাবলম্বীরা সেই প্রমাণটিকে যাচাই করে দেখা যাক। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রতি সপ্তাহে ধর্মের ব্যাখ্যান করতেন কমল বসুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদী প্রতিষ্ঠানে। ইচ্ছে করেই এই প্রতিষ্ঠানটিকে কোনো নাম দিতে আপাততঃ বিরত থাকলুম। প্রতিটি বক্তৃতা একটি পুস্তিকা করে পরে বের করা হয়। এরকম অন্তত ঊনসপ্ততি ব্যাখ্যান পণ্ডিত রামচন্দ্র দিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। প্রত্যেকটি পুস্তিকার উপরে ব্রাহ্মসমাজ কথাটি এবং তারিখ ও শক মুদ্রিত আছে। কিন্তু এই তারিখ ও শক কিসের নির্দেশক? এটি কি যখন মুদ্রিত হোলো তার নির্দেশক? না, সেটা আদবেই তা নয়। কবে কোন তারিখে বক্তৃতাটি দেওয়া হয়েছে, সেই তারিখ ও সন পুস্তিকাগুলির উপরে লিখিত আছে। যেমন, প্রথম পুস্তিকার উপরে লেখা আছে বুধবার ৬ ভাদ্র শকাব্দা ১৭৫০, দ্বিতীয় পুস্তিকার উপরে—বুধবার, ১৩ ভাদ্র, শকাব্দা, ১৭৫০, তৃতীয় পুস্তিকার উপরে — বুধবার, ২০ ভাদ্র শকাব্দা ১৭৫০, চতুর্থ ব্যাখ্যানের উপরে—বুধবার, ৩০ ভাদ্র, শকাব্দা ১৭৫০, পঞ্চম ব্যাখ্যানের উপর — শনিবার, ৭ই আশ্বিন, শকাব্দা ১৭৫০, ষষ্ঠ ব্যাখ্যানের উপর — শনিবার, ১৩ আশ্বিন, শকাব্দা ১৭৫০, সপ্তম ব্যাখ্যানের উপর — শনিবার, ২০শে আশ্বিন, শকাব্দা ১৭৫০, অষ্টম ব্যাখ্যানের উপর, শনিবার, ২৭শে আশ্বিন, শকাব্দা ১৭৫০, নবম ব্যাখ্যানের উপরে শনিবার ১০ কার্তিক, শকাব্দা ১৭৫০ আর দশম ব্যাখ্যানের উপর—শনিবার, ১৭ কার্তিক শকাব্দা ১৭৫০। এগুলি হচ্ছে বক্তৃতাগুলি যে যে তারিখে দেওয়া হয়েছে সেই দিনগুলি। যেমন ঊনসপ্ততি ব্যাখ্যানের মলাটে লেখা রয়েছে—শনিবার, ১১ই মাঘ, শকাব্দা ১৭৫১। অতএব এই তারিখ ও সাল পুস্তিকাগুলি কবে কবে ছাপানো হয়েছে তার কোনো প্রমাণ আমাদের সামনে হাজির করে না। বক্তৃতাগুলি কোন কোন তারিখে দেওয়া হয়েছে শুধু সেইটি আমাদের জানিয়ে দেয়। এই পুস্তিকাগুলিতে লেখা নেই যে কোন প্রেস থেকে কবে ছাপা হয়েছে ব্যাখ্যানগুলি। সেটি থাকলে বইগুলি কবে ছাপানো হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারতুম। আর প্রেসলাইন যে তখন থেকে চালু হয়ে গেছে তার প্রমাণ আমরা আর একটি আরো আগে ছাপা বই থেকে পাই। বইটি হচ্ছে, পথ্যপ্রদান "Medicine for the sick" "লেখক হচ্ছেন একজন" who laments his inability to perform all righteousness", বইটির মলাটে ইংরিজীতে ও বাঙলাতে শিরোনামা লেখা থাকায়, ইংরিজী ও বাংলাতে বইটি কোন প্রেস থেকে কোন সালে ছাপা হোলো তা লেখা আছে — "সংস্কৃত যন্ত্রায়ন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দা ১৭৪৫। Printed at the Sungscrit Press 1823".

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দত্ত ব্যাখ্যান পুস্তিকাগুলির মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় বক্তৃতার তারিখ ও সাল দুই-ই পাচ্ছি কিন্তু মুদ্রণের তারিখ ও সাল পাচ্ছি না। সেটি পেলে তবে বোঝা যেতো যে পুস্তিকাগুলির উপরে যে 'ব্রাহ্মসমাজ' কথাটি লেখা আছে সেটি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত পুস্তিকাগুলির উপরে লিখিত না ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পরে ছাপানো পুস্তিকাগুলির প্রচ্ছদপটে লিখিত। সেটি বোঝবার কোনো উপায় আপাতত নেই। এই ব্যাখ্যানগুলির প্রথম ব্যাখ্যান থেকে সপ্তদশ ব্যাখ্যান নিয়ে ১৭৫৮ শকে (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) একটি দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। সেই সংস্করণটির একটি কপি লণ্ডনে ব্রিটিশ

মিউজিয়মে আছে। তাতে হয়তো প্রথম সংস্করণ করে ছাপা হয়েছিল সে কথার উল্লেখ থাকতে পারে। কিন্তু যে ব্যাখ্যান পুস্তিকাগুলিকে প্রমাণ স্বরূপ হাজির করেছেন রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ মতাবলম্বীরা সেই পুস্তিকাগুলির আখ্যাপত্রে মুদ্রিত 'ব্রাহ্মসমাজ' এবং তারিখ ও শকাব্দ থেকে এটা আদবেই প্রমাণিত হয় না যে ব্রাহ্মসমাজ ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ মতাবলম্বীদের তৃতীয় ও শেষ যুক্তি হচ্ছে এই যে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে রামমোহন তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদকে যে চিঠি লেখেন তার এক-জায়গায় রামমোহন লিখেছেন — "এই অবকাশ **ব্রাহ্মসমাজের** কাজের নিমিত্ত এক গীত পাঠাইতেছি।" এঁদের মতে এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে রামমোহনের সময় ব্রাহ্মসমাজ হয়ে-ছিলো। কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা এই চিঠিতে যেমন ব্রাহ্মসমাজ কথাটির উল্লেখ আছে, তেমনি উল্লেখ আছে ব্রহ্মসভা কথাটির। রামমোহন লিখছেন—"ব্রহ্ম-**সভার** কিরূপ নির্ব্বাহ হইতেছে লিখিবে।" যাঁরা এই চিঠির নজীর দেন তাঁরা চিঠির এই অংশটুকু উদ্ধৃত করলেন না কেন জানি নে। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই ধরণের বিস্মরণ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তাছাড়া বিতর্কের বস্তুটিকে বার বার বদল করে নিলে তো চলেনা। বিষয়টি আলোয়ার মতো পিছল ও অন্ধরা হলে আর বহুরূপীর মতো রঙ বদলানোর খেলোয়াড় হলে সব গবেষণা বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য। বিতর্কের বস্তু তো এটি নয় যে রামমোহন বেঁচে থাকতে থাকতে **ব্রাহ্মসমাজ** হয়েছিলো কিনা। বিতর্কের বস্তু হচ্ছে এই যে রামমোহন নিজে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কি করেন নি আর তিনি ভারতবর্ষ ছাড়বার আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ বলে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছিলো, না হয়নি। আমার মতে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ নামে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন নি, তিনি ব্রহ্মসভা স্থাপন করেছিলেন আর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি পর্যন্ত অর্থাৎ কিনা তাঁর ভারত-ত্যাগের কাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ নামক কোনো প্রতিষ্ঠান এদেশে ছিলো না। রামমোহনের চলে যাওয়ার পরে ব্রাহ্মসমাজ নামটি দিয়ে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ব্রহ্মসভার উদার বিশ্বজনীনতাকে খর্ব করে ব্রাহ্মসমাজ নামে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়। আমি আগেই বলেছি যে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্রহ্মসভা ব্রাহ্মসমাজ রূপে পরিবর্তিত হয় আর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই পরিবর্তনটি সাধন করেন। তিনিই 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম বলে প্রচার করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম' বলে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব ছিলো না। রামমোহন বৈদান্তিক ছিলেন না। সেকালের প্রসিদ্ধ লেখক ও সাংবাদিক কিশোরী চাঁদ মিত্র 'ক্যালক্যাটা রিভিউ' পত্রিকায় লেখেন—

"It was his (Rammohun's) system to avoid so far identifying himself with any religious body as to make himself answerable for their acts and opinions. We would go further and say, though it may startle and scarify the Bramhos of the old regime, that *he was not a Vedantist*".

অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানে সে কথা অতি সুস্পষ্ট করে বলেন — "যে সকল ব্যক্তি সে সময়ে তাঁহার (রামমোহনের—লেখক) মতের অনু-বর্তী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সকলেই প্রায় বেদান্তানুগত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, রামমোহন রায়ের

ন্যায় শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তি-পথাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন না। ... যদিও তিনি এতদ্দেশে স্বীয় মত সংস্থাপনার্থ সমগ্র শাস্ত্র হইতে এবং বিশেষতঃ বেদান্ত শাস্ত্র হইতে প্রমাণপুঞ্জ সংকলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে বাস্তবিক বৈদান্তিক ছিলেন না, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই ..... রামমোহন রায় আপনার অভিপ্রায় গোপন রাখেন নাই। ..... তিনি ভারতবর্ষের তৎকালবর্তী শাসনকর্তাকে এক পত্র লিখিয়া এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সেই পত্রে ইংলণ্ডীয় ভাষায় অশেষ বিধ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান করা নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া বেদান্তাদি কতিপয় শাস্ত্রের কাল্পনিক মতের অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত নানা প্রকার মনঃকল্পিত ভাবে পরিপূর্ণ; অতএব তৎসমুদয়ের অধ্যয়নে তাদৃশ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা — ফাল্গুন (১৭৭৬ শক)

এই বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন — "তিনি (চন্দ্রশেখর বসু—লেখক) রামমোহন রায়কে যে রূপে বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দেখিলে আপাতত অনেকেরই ভ্রম হইবে যে রামমোহন রায় একজন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের সকল প্রকার মতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রমটি দূর করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ..... তিনি (রামমোহন—লেখক) অগাধশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য একেশ্বরবাদ স্থাপন। এই প্রসঙ্গে তিনি তর্কের মুখে প্রতিপোষক বাক্য-শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে যাহা পাইয়াছেন তাহাই উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন পাঠমাত্রেই বোধ হইবে যে হিন্দুশাস্ত্রের সকল কথাতেই তিনি বিশ্বাস করতেন। বাস্তব তাহা নহে। ..... এস্থলে একটী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। যখন তাঁহার সহিত সর্বসাধারণের ঘোরতর শাস্ত্রীয় বিচার হয় তখন তিনি আপনাকে কুত্রাপি ব্যক্ত করেন নাই। যা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন সমস্তই শাস্ত্র। এইগুলি ধরিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে অবশ্যই ঘোর বৈদান্তিক বোধ হইবে। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যক ছিল। তাহা আলোচনা করিলে তিনি যে কি ছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময় যখন শিক্ষাসমিতিকে পত্র লিখেন তাহাতে স্পষ্ট বলিয়াছেন বেদান্তদর্শন এদেশের যথেষ্ট সম্মান করিয়াছে.....যাক্ রামমোহন রায় যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন না তাহার প্রমাণ আছে।.....জীব ব্রহ্মের একত্বমতে বিশ্বাস থাকিলে উপাস্য উপাসক ভাবের আর স্থান থাকে না। কিন্তু রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তিত করিয়াছেন।.....যদি জীব ব্রহ্মের একত্বে তাঁহার বিশ্বাসই ছিলো তবে ব্রাহ্মসমাজে এই বিসম্বাদী পদার্থের আবার অবতারণা কেন (ধর্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায়—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৮০৮ শক) অক্ষয়কুমার দত্ত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই দুই বিখ্যাত চিন্তাবিদদের মন্তব্য থেকে এইটেই সুস্পষ্ট হচ্ছে যে রামমোহন বৈদান্তিক ছিলেন না। অতএব তিনি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম এই ধারণার জনক কখনই নন। কে তাহলে এই ধারণাটিকে **ব্রাহ্মসমাজের** মূল ধারণা করে চালিয়ে দিলো? তার সন্ধানে এবার বের হওয়া যাক। ১৮০৮ শকের শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ব্রাহ্মসমাজ ও ইহার অতীত ও বর্তমান' নামক প্রবন্ধের রচয়িতা লেখেন—"রামমোহন রায়ের অবলম্বন প্রধানত বেদ ও বেদান্ত। নিতান্তই বেদের প্রামাণি-কতা এই বিশ্বাস তৎকালে লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট ছিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের কার্য-প্রণালী পর্যালোচনা করিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে তিনি এই সাধারণ বিশ্বাসের অনুকরণ করিয়াছেন। তথাচ তিনি যখন দেশ কাল পাত্রের অনুরোধে এই বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া

যান তখন লোকের মনে বেদের নিত্যতার উপর বিশ্বাস অটল ছিল। তাঁহার লক্ষ্য যে কোনরূপে হউক দেশব্যাপী উপধর্ম নির্মূল করিতে হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন ধর্ম উন্নত না হইলে নির্জীব হিন্দুসমাজে পুনরায় সজীবতা আসিবে না। লোকে বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করুক আর নাই করুক তাহাতে কিছু আইসে যায় না। বেদ-প্রমাণে যদি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে এইটুকুই পরম লাভ। সম্ভবত তিনি এই জন্য বেদের উপর কোনরূপ আঘাত করিতে নিরস্ত ছিলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার সর্বযোগী সুপণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে যে সকল উপদেশ দেন তাহা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি শঙ্করের ন্যায় বেদ ও অনুভবকে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশের স্থানে স্থানে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাও আছে যে মনুষ্য চরমে ঈশ্বরে লীন হয়। বিদ্যাবাগীশ প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। যে শিক্ষা রামমোহন রায়কে স্বাধীন বুদ্ধি দিয়াছিল কিছু দিন পূর্বের ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সেই রূপ শিক্ষা ছিল না। ফলত তিনি যে একজন বৈদান্তিক ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হয় না। এই বেদান্তবিৎ পণ্ডিত যে উপদেশ ও আলাপে লোকের মনে বেদের নিত্যতা ও বৈদান্তিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া যান এই বিষয়ে তাঁহার শান্ত্রব্যাখ্যানই প্রমাণ। যাহাই হউক বেদ নিত্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম বৈদান্তিক ধর্ম ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ইতিহাসে যে এই কথা পাঠ করা যায় সম্ভবত এইটুকুই তাহার মূল।"

'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম' এটি ব্রাহ্মসমাজের ধারণা-কেন্দ্রে কে এনে হাজির করেছিলেন সেটি একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেলো।। প্রবন্ধকার স্পষ্টভাবে বলেছেন যে রামমোহনের মৃত্যুর পরে অর্থাৎ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের ধর্মকে বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম বলে ঘোষণা করেছেন। রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভার অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়ী সাধনার জায়গা নিলো একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মমত। এই ধর্মমতকে ব্রাহ্মসভার কেন্দ্রে বসাবার প্রচেষ্টার সঙ্গে ব্রহ্মসভাকে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত করার ইতিহাস অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সকল ধর্মের একেশ্বরবাদীদের মিলন-ক্ষেত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন রামমোহন। কোনো বিশেষ ধর্মের লোকদের জন্যে সমাজ পত্তন করা তাঁর বিশ্বস্পর্শী চিন্তার প্রত্যন্তসীমাকেও স্পর্শ করে নি। কিশোরীচাঁদ মিত্র ঠিকই বলেছেন—

"....He belonged to no existing sect, nor did he seek to inaugurate a new system of religion. The great ambition of his life was to promote love to God and love to men. This he tried to effect by bringing together men of existing persuasions, irrespective of all distinctions of colour and creed into a system of universal worship of the One True and Living God..... It is therefore, manifest that what Rammohun Roy wanted was not unity of creed or the creation of a separate religious community like that of the Brahmos, but to spread monotheistic worship, to establish a universal church where all classes of people,—Hindus, Mahomedans, and Christians,—would be all alike welcome to unite in the worship of their supreme and common Father".

—Calcutta Review

তাছাড়া একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে গেলে যা যা করা উচিত রামমোহন তার একটিও করেন নি। রাজনারায়ণ বসুর মতে—"ধর্ম-সম্প্রদায়ের যে সকল প্রয়োজন তন্মধ্যে তিনটি প্রধান প্রয়োজন রামমোহন রায়ের সময় সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ উপাসনার

প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল না; কেবল উপনিষদের শ্লোক ও বেদান্ত-সূত্র সকলের ব্যাখ্যা হইত। দ্বিতীয়তঃ তখন ব্রাহ্ম-দল বলিয়া দল-বদ্ধ কোনো সম্প্রদায় ছিল না; তখন প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। তৃতীয়তঃ আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সত্য; যাহা সকল ধর্মের মূলে নিহিত আছে; যাহা তর্ক-তরঙ্গ দ্বারা কখনই আন্দোলিত ও নিরস্ত হইতে পারে না ও যাহা সকল মনুষ্যের হৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজমান আছে; এক্ষণে যেমন সেই আত্মপ্রত্যয়মূলক সত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্মকে স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এ রূপ তখন ছিল না।"

(ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত এবং লক্ষণ—রাজনারায়ণ বসু)

এই আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ধারণা ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি প্রতিষ্ঠিত চলতি কথা ও সাম্প্রদায়িক মনের অভিলাষের উপর। এই প্রসঙ্গে এটিও মনে রাখতে হবে যে ব্রাহ্মধর্ম বলে কোনো ধর্মের উল্লেখ আমরা রামমোহনের সময় পাই না। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সময়েও ব্রাহ্ম ধর্ম বলে কোনো ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন তখনও ব্রাহ্মধর্ম বলে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব নেই। তত্ত্ববোধিনী সভা যে ধর্মের প্রচার করছিলেন সে ধর্ম ছিলো রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রবর্তিত বেদান্ত প্রতিপাদ্যধর্ম। নানা শাস্ত্র থেকে, বিশেষ করে উপনিষদ থেকে বচন সংগ্রহ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক গ্রন্থ সংকলন করেন ও তার অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের আগে তাই ব্রাহ্মধর্ম বলে কোনো ধর্ম ছিলো না। তবে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম যে 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম' নয়, তার ধর্ম যে ব্রাহ্মধর্ম এটি ঘোষিত হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে। ১৭৮৬ শকের ১১ই পৌষ তারিখে তত্ত্ববোধিনী সভার একটি অধিবেশনে এই পরিবর্তনটি সাধিত হয়। 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম' কথাটি বর্জন করে তার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম কথাটি প্রবর্তন করবার প্রস্তাব আনেন রাজনারায়ণ বসু আর সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বলাই বাহুল্য যে তাঁদের এই প্রচেষ্টার পেছনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন ছিলো।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করে আমরা তিনটি প্রণিধানযোগ্য ঐতিহাসিক স্তর দেখছি—

প্রথম স্তর—সব ধর্মের একেশ্বরবাদীদের সমন্বয় সাধনের জন্যে রামমোহন কর্তৃক ব্রহ্মসভার স্থাপনা।

দ্বিতীয় স্তর—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন এবং 'বেদান্তপ্রতিপাদ্যধর্ম'-কে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম বলে ঘোষণা। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম বলে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব নেই।

তৃতীয় স্তর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রাহ্মধর্ম সৃষ্টি ও ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্মের বনিয়াদের উপর পুনর্প্রতিষ্ঠিত করা।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এই তিন স্তর দিয়ে রচিত। তার সর্বপ্রথম স্তর হয়েছে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভার স্তর। সেই প্রথম স্তরের ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও আলোচনাই আমরা এই প্রবন্ধে করেছি।

বড় টাইপ ও ইটালিক্‌স্‌এর দ্বারা প্রযুক্ত ঝোঁকগুলি — লেখকের।

আজি মম জন্মদিন

সোমেন বসু

যেদিন আমরা প্রথম এসেছি এই পৃথিবীতে সেদিন কোন আসক্তি আমাদের দেহে মনে জড়িয়ে নিয়ে আসিনি। তারপর থেকে দিনে দিনে সংসারের ধূলিধূসরতায় নানা আসক্তির জালে জড়িয়ে পড়ি। এই পৃথিবীর রূপরসগন্ধ ভালো লাগলো, ভালো লাগলো তার সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, তার আকাশ, তার তৃণতরু, তার কোমল মানবহৃদয়গুলিকে। সেই ভাললাগায় মন জাগলো, বোধ জাগলো, সূর্য উঠলো অনুভূতির আলোকে চেতনাকে উদ্ভাসিত করে। আবার অন্যদিকও আছে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের গতানুগতিক মলিনতায় চাপা পড়ে গেল আমাদের সত্তার সেই আদি পরিচয়- যে পরিচয় আমরা সমস্ত বিশ্বের প্রাণধারার সঙ্গে একটি গভীর যোগে আবদ্ধ, যে পরিচয় না পেলে জীবনের মহৎ প্রকাশের ধারণা জাগে না মনে।

আমাদের জীবনের রূপ চিত্রার্পিত তটস্থ ঘোড়ার রূপ নয়। চারটে পা শূন্যে তুলে যে ঘোড়া পটে ধরা পড়েছে সে তার স্বভাবধর্মটিকেই যেন বিদ্রূপ করছে, তার পূর্ণ স্বভাবের প্রকাশ তো সেই পটের ছবিতে নেই অথচ সেই ক্ষণিকের রূপটাও তো মিথ্যে নয়। আমাদের প্রথম জন্মদিন থেকে যে জীবনের ধারাটি চলছে তাকে কোন একটা বিশেষ রূপের ছাঁচে ফেলতে তাই রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত আপত্তি। আমি চলেছি মুহূর্তে মুহূর্তে, চলা আমার ধর্ম অথচ আমি যে ক্ষণিকের জন্য থেমে দাঁড়াই এটাও মিথ্যে নয়। সেই থামা আর চলার কাব্য হলো জীবন। নিজের জীবনের সেই চলা-থামার ছন্দ মেলাতে মেলাতে কত রকমের ভাবনাই মনে জাগে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শুধু মানুষ কেন প্রত্যেক জীবন্ত সৃষ্টির মধ্যেই একটি গূঢ় চৈতন্য কাজ করে চলেছে—কবি তাকে বলছেন প্রাণ-প্রবর্তনা। নিজের জীবনে সেই প্রবর্তনাকে উপলব্ধি করে কবি বলছেন 'আজ পিছন ফিরে দেখি যখন তখন আমার প্রাণ যাত্রার ঐক্যে সেই অভিব্যক্তকে বাইরের দিক থেকে অনুসরণ করতে পারি, সেই সঙ্গে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি তাকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে অদৃশ্য পুরুষ একটি সংকল্প ধারায় জীবনের তথ্যগুলিকে সত্যসূত্রে গ্রথিত করে তুলছে।" (জন্মদিনে প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ-১৩৪৭)।

নিজের প্রাণশক্তির এই ক্রমবিবর্তনের ধারাটিকে তাঁর জন্মদিনের কবিতাগুলির মধ্যে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন — আর বলেছেন এই বিশ্বসংসারের সঙ্গে তাঁর একান্ত নিবিড় আত্মীয়তার কথা। একটি একটি করে জন্মদিন এসেছে আর মুগ্ধ কবি আনন্দ বিহ্বল চিত্তে স্মরণ করেছেন "যত্ত যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশী। আজ বুঝতে পারি এই জন্যেই আমার আসা। আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের আমি যাচনদার বার বার বলতে এসেছি ভালো লাগলো আমার।" (জন্মদিনে)

নিজের জন্মদিন তাঁর কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা রবীন্দ্র-অনুরাগী মাত্রেই জানেন। নিজেকে নতুন করে অনুভব করার সুযোগ ২৫শে বৈশাখে তিনি করে নিতেন তাই কবিতায় গানে প্রবন্ধে তার নিত্যনূতন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন আনন্দের সঙ্গে। প্রতিবছর যতই বয়স বেড়েছে ততই যেন গভীরতর অনুরাগের সঙ্গে জন্মদিনটিকে নিবিড়ভাবে পাবার চেষ্টা করেছেন

নিজের মনে নিজের অন্তরে। নিজেকে নতুন করে প্রকাশ করবার আনন্দেই এই উৎসবটি তাঁর এত প্রিয়— আশীবছরের আয়ুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন — "জানিনে আর কখনো উপলক্ষ্য হবে কিনা, তাই আজ আমার আশীবছরের আয়ুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে পরিচিত করে যেতে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু সংকল্পের সঙ্গে কাজের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কখনোই সম্ভবপর হয়না। তাই নিজেকে দেখতে হয় অন্তর্দিকের প্রবর্তনা ও বহির্দিকের অভিমুখিতা থেকে।"

১৩১৭ সালে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় বালকদের কাছে তিনি এক ভাষণে জন্মদিনের কথা বলেছিলেন। তাতেই বলেছেন যে বেশ কিছুকাল জন্মদিন সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা তাঁর মনে হয়নি। 'কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড়ো করে আমার কাছে প্রকাশ করেনি।' তবে প্রিয়জনেরা তাঁর জন্মদিনের জন্য কখনো কখনো ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন করেছেন। সেদিন তাঁদের সেই অভিনন্দনে কবি নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। সংসারের বহুর মধ্যে যে এক, সেই এক নিজে যেখানে একমাত্র সেখানে তাঁর দৃষ্টি পড়তো। ব্যবহারিক জীবনের দেখা শোনা, কথাবার্তার শেষে একটি লক্ষ্য আছে তা হলো নিজেকে জানানো। সমস্ত সংসারের সঙ্গে আত্মীয়তার একটি নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন তাই জন্মদিনের উৎসবের প্রেরণা। "আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসব কর্চ্ছো তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তা হলেই এই উৎসব সার্থক।" নিজের চিরন্তন নবীনতা যে কেবলি সকল মালিন্যের আবরণ মুছে নিজেকে প্রকাশ করছে সে কথাও ঐ ভাষণেই বলেছেন — "আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নতুনভাবে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকালে তোমাদের আনন্দ উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করছি।"

১৩২৬-এর ২৫শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনের আশ্রমে তাঁর ৫৯তম জন্মোৎসব হয়েছিল। জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিয়মিত সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রু বোধহয় এই বছর থেকেই। অবশ্য মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম আছে ২৪শে বৈশাখ কবি একটি গানে তাঁর ভাব ব্যক্ত করলেন — "আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়" — তখন থেকেই তাঁর নানা লেখায় ও গানে বিদায়ের সুর জুড়ে দিয়ে কবি মনে করেছেন তাঁর যাবার সময় সত্যি বুঝি কাছে এলো। সেই যুগে সবজপত্র প্রকাশিত হচ্ছে বিপুল গৌরবে — তার মধ্যে তিনি প্রাণের বিজয়ী মূর্তির প্রকাশ দেখেছেন। সে কথাও লিখেছেন ৭ই বৈশাখ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক চিঠিতে। তাতে লিখছেন নিজের সম্বন্ধে "এই যে এগোবার দিকে চলেছি এখন আমাকে পিছু ডেকোনা। বিধাতা আমাকে বর দিয়েছেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেইজন্যে যৌবনমধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেছে। আমার জীবনের শেষ কাজ এবং শেষ আনন্দ ঐখানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েছে। (চিঠিপত্র ৫ খণ্ড)

গানটির মধ্যে কিন্তু নিছক এই শেষের কথাই নেই। সেখানে নিজের মধ্যে নবীনের আবির্ভাব অনুভব করছেন। জীর্ণ পাতা শুধু চলেই যায় না সে নূতনকেও আহ্বান জানিয়ে যাবে। জীবনে যে সেই নবীনের প্রকাশ সত্য হয়েছে এতদিন গানের প্রথমে তাই বলেছেন—

আমার জীর্ণপাতা যাবার বেলায় বারে বারে তাইতো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ডাক দিয়ে নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ফাল্গুনে আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়।

তারপর বিদায়ের সুরটি একটি রহস্যঘেরা চিত্ররূপের মধ্যে সুন্দর ফুটেছে—

দিনের শেষে নিভলো যখন পথের আলো তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে
সাগরতীরে যাত্রা আমার সেই ফুরালো শূন্যে আমার উঠলো তারা সারে সারে।

১৩২৭ সালে পারিবারিক কোন অসুবিধায় তাঁর জন্মোৎসব হয়নি — সেই উপলক্ষ্যে কোন কবিতা বা সাহিত্যসৃষ্টিরও দেখা নেই।

১৩২৮ সালে কবি গেছেন জেনেভায় — সেখানে বন্ধুবান্ধব আপন জনেরা কেউ নেই বাংলার শ্যামল প্রকৃতি বা বীরভূমের লালমাটির জন্য কোনই তৃষ্ণা অন্তরে নেই এমন নয়—তাই দীনবন্ধু এনড্রুসকে লিখছেন "আজিকার দিন যথার্থভাবে আমার জন্যে নহে। যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহাদেরই আনন্দের দিন। তোমাদের কাছ হইতে দূরে আজিকার এই দিন আমার কাছে পঞ্জিকার তারিখ মাত্র। আজ একটু নিরালা থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই।"

১৩২৯-এর ২৫শে বৈশাখ কবি শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মাবকাশ ভোগ করছেন। ভীড় নেই, উত্তেজনা নেই। সে বছর লিখলেন ২৫শে বৈশাখ' কবিতা (পূরবী)—পরে কবিতাটির অংশ-বিশেষ বদলে গান তৈরী করেছিলেন।

নিজের প্রথম আবির্ভাবের গৌরব অনুভব করার চেষ্টা ও আনন্দ থেকে এই কবিতার জন্ম। বার বার ২৫শে বৈশাখ ফিরে আসে, কখনো আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে, তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে, কখনো শুষ্কপত্র বাতাসে উড়িয়ে মত্তহীন বেগের প্রাবল্য তাঁর সমস্ত সত্তায় সঞ্চারিত করে দিয়ে। আবার কখনো তার প্রশান্ত আবির্ভাবে নীলকান্ত আকাশের থালার পরে ভুবনের উচ্ছ্বসিত সুধার পেয়ালাটিকে দেখে কবির প্রাণ-দেবতাকে মনে পড়ে। ভাবকল্পনার আশ্চর্য গভীরতায় এ কবিতা যেমন পূর্ণ তেমনি এর ভিতরকার বাস্তি হৃদয়ের স্পর্শটুকুও অনুভব করা কঠিন নয়। এই যে পঁচিশে বৈশাখের নানারূপ কি তার কারণ কি তার সার্থকতা। আমরা যেদিন প্রথম পৃথিবীতে এসেছিলুম সেদিন তো অম্লান পবিত্র কুসুমের মতোই এসেছিলুম। তারপর বছরের পর বছর সেই কুসুমের দলগুলির উপর ধূলির আবরণ পড়লো, তার রং বিবর্ণ হলো, তার রূপ সেই প্রথম দীপ্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলো না। জন্মদিন শুধু উৎসবের বিলাসমূর্তি নিয়েই এলোনা। এলো সেই প্রথম অম্লান সত্তাকে পুনরুদ্বুদ্ধ করার মন্ত্র নিয়ে। সেই প্রথম জন্মদিনকে যদি নদীর উৎসমুখ মনে করা যায় তাহলে একথা মনে করা যায় যে আজও সেখান থেকে জীবনের স্রোত অজস্র ধারায় ঝরে ঝরে পড়ছে — সেই প্রথম জন্মদিন সমস্ত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বদ্ধ, যেমন নদীর সঙ্গে তার উৎস। এই জন্যেই জন্মদিনের স্মৃতির জাগরণ —

মনে রেখো হে নবীন যেদিন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে
তোমার প্রথম জন্মদিন তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
ক্ষয়হীন প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।

নিজের সকল রিক্ততার দেনা মিটিয়ে জীবনের জয়হোক, প্রাত্যহিকের জড়তার উপর নূতনের প্রকাশ সূর্যের মত দীপ্ত হোক — এই হলো জন্মদিনের প্রার্থনা। এবার সেই বিদায়ের সুরটি নেই। একটি বলিষ্ঠ আত্মউদ্বোধনের প্রচেষ্টা এই কবিতার আগাগোড়া ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

নিজের মধ্যে যে একটি অফুরন্ত প্রাণউৎস রয়েছে তাকেই নতুন করে পাবার জন্যে জন্মদিনের এই উৎসব।

১৩৩০-এ কবি শিলং বাসে দিন কাটাচ্ছেন — এবারে পঁচিশে বৈশাখের কোন উৎসব বা কবিতার সন্ধান নেই।

১৩৩১-এ কবি চীন ভ্রমণে গেছেন সঙ্গে এলমহার্স্ট সাহেব, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন সেন প্রভৃতি গেছেন। জন্মদিনের উৎসবের উল্লেখ পাচ্ছিনা। তবে পরবর্তীকালে এই চীনবাসের পঁচিশে বৈশাখকে স্মরণ করে কবি কবিতা লিখেছিলেন একটি —(জন্মদিনে—৩নং কবিতা)

একদা গিয়েছি চীন দেশে
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' বলে
* * * * * *
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।

কবির জন্মদিন শুধু পাঁজির পাতায় ২৫শে বৈশাখ হয়েই নেই — যেখানেই নিজেকে নতুন করে অনুভব করার সুযোগ হয়েছে সেখানেই জন্মদিন। জীবন যেমন তাঁর কাছে স্থবির গতিহীনতা নয় তাঁর জন্মদিনও তেমনি অচল অনড় নয় — মনের ভিতরে কেবলি নতুন করেসৃষ্টিহচ্ছে তাঁর সেই জন্মদিনের। তাই ঐ কবিতাতেই বলছেন

জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ একথা রহিল মোর মনে।

১৩৩২-এ কবির জন্মদিন বিপুল আয়োজনের মধ্যে সম্পন্ন হলো। সেইদিন 'পঞ্চবটি'র প্রতিষ্ঠা হলো শান্তিনিকেতনে। এবছরেও কোন নতুন কবিতা নেই—'পঞ্চবটি' উপলক্ষে গান লিখেছেন 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ।' মনে মনে নিজের অতীতের সঙ্গে একটি গভীর স্নেহের যোগ অনুভব করছেন — যে যোগ অস্তোন্মুখ সূর্য অনুভব করেন তাঁর উদয়মুহূর্তের সঙ্গে। একদিন যখন জীবন ঘরের লোকদের স্নেহের কেন্দ্রে আবর্তিত হচ্ছিল তখন জন্মদিনের উৎসব ছিল একরকম আর বাইরের সংসারে যখন দ্বার খুলে গেল তখন যারা 'পর' তাদের দাবী বড় হলো — কবির ডাক এলো তাই 'পরলোকে'। ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড) কবি বলছেন —"এমন একদিন ছিল যখন আমার জন্মদিনের সার্থকতা তোদের কাছে ছাড়া আর কোথাও ছিলনা। ক্রমে কখন একসময়ে আমার জীবনের ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ হয়ে পড়লো সেটা যেন আমার জন্মান্তরের মতো। সেই আমার নবজন্মের জন্মদিন এতদিন চলে এসেছে। যেটাকে আমার জন্মান্তর বল্লুম তাকে আমার পরলোকও বলা চলে। অর্থাৎ যারা পর ছিল তাদের মধ্যেই একদিন আমার অভ্যর্থনা সুরু হয়েছিল। তোদের লোক থেকে এই লোকান্তরগতকে তোরা হয়ত স্পষ্ট করে দেখতে পাসনি। যে ঘাট থেকে জীবনযাত্রা প্রথম সুরু করেছিলুম আমার কাছেও মাঝে মাঝে তা ঝাপসা হয়ে আসছিলো। কিন্তু এটা হলো মধ্যাহ্ন কালের কথা। এখন অপরাহ্নের মূলতানীসুর হাওয়ায় বেজে উঠেছে। আলো কমে এলো। এখন দেখতে পাচ্ছি ভোরবেলা আর গোধূলি বেলার একই গোত্র। অর্থাৎ প্রথম আলোয় যেখান থেকে যাত্রা সুরু হয়, শেষ আলোয় সেইখানেই যাত্রা শেষ হতে চায়। সেইটেই হলো প্রাণের টানের জায়গা। .....

এবার যখন থেকে শরীর অপটু হয়ে পড়লো, তখন থেকেই আমার কারখানা ঘরের দরজা যেন বন্ধ হয়ে আসছে। বেরিয়ে এসেই দেখি যেখানে ভীড় নেই সেখানে আমার বালককাল। সেখানে যে বিশ্বপ্রকৃতি ভোর বেলায় আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে লালন করেছিল, সেই প্রকৃতিই সন্ধ্যা যূথীর মালা আমার জন্য গেঁথে রাখছে।.....আবার আমি ফেলে দিয়েছি আমার বই, আমার কাজ। আমার মন আবার পলাতক।.....

তার মানে বালকটা লোকান্তরগত হয়নি। ৬৫ বছরের গেটের কাছে যেখানে সানাইয়ে পূরবী বাজছে, সেখানে সেই অকিঞ্চনটা ধুলোয় বসে আছে—সে ভোলা তেমনি ভুলেই রইলো, তার বুদ্ধি পাকলো না .....

তোরা থাকলে এবারকার জন্মোৎসবের রস পূর্ণ হতো।" শুধু এই নয় — ইন্দিরা দেবী বই পাঠিয়েছিলেন উপহার। কবির মন শ্রান্ত — বই পড়ার উৎসাহও কিছুদিনের জন্যে স্তিমিত — পারান্তরে যাবার কথাটাই মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই ঐ চিঠিতেই বলছেন "এবারকার জন্মদিনে বই আমার ঠিক উপহার নয়। এবার ঘাটে ফেরা নৌকার পক্ষে তীরের থেকে শুধু উলুধ্বনিই যথেষ্ট হতো।"

১৩৩৩-এ শান্তিনিকেতনে বেশ আয়োজন করেই কবির জন্মদিন হলো। উদ্যোক্তাদের তাগিদে কবি 'নটীরপূজা' নাটক লিখলেন। এই উৎসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা জীবনীরচয়িতা প্রভাত মুখোপাধ্যায় দিচ্ছেন — "সেদিন উৎসবক্ষেত্রে দেশবিদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথাবিধ মাঙ্গল্য অনুষ্ঠানের পর ফরাসী কন্সাল বক্তৃতাপ্রসঙ্গে য়ুরোপ ও বিশেষভাবে ফ্রান্সে কবির প্রভাব সম্বন্ধে বলিলেন। ইতালীয় কন্সাল কবির প্রস্তাবিত ইতালী ভ্রমণের সম্ভাবনায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বিশ্বভারতীর চীনা অধ্যাপক শ্রী তোং লিম চীন দেশের পক্ষ হইতে কবিকে উপঢৌকন দিলেন। মিঃ এনড্রুস দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের হইয়া কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। মিঃ জেমস কাজিনস আইরিশ জাতির পক্ষ হইতে কবির আয়ুবৃদ্ধি কামনা করিলেন। এই দিন উপলক্ষে পোরবন্দরের মহারাজা বিশ্বভারতীকে কয়েক সহস্র টাকা দানরূপে পাঠাইয়াছিলেন।" এইবার কবি একটি কবিতা লিখলেন — 'বাঁশি যখন থামবে ঘরে নিববে দীপের শিখা' — এ কবিতা ঠিক জন্মদিনের কবিতা নয়। যে কোন কারণেই হোক কবির মন অত্যন্ত উত্তেজিত ছিল — তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে সভাসমিতিতে কি কাণ্ড চলবে সেটা আশঙ্কা করেই তিনি বলছেন —

'বাঁশি যখন থামবে ঘরে নিববে দীপের শিখা
এই জনমের লীলার পরে পড়বে যবনিকা
সেদিন যেন কবির তরে ভীড় না জমে সভার ঘরে
হয়না যেন উচ্চস্বরে শোকের সমারোহ;
সভাপতি থাকুন বাসায় কাটান বেলা তাসে পাশায়
নাই বা হলো নানা ভাষায় অহো উহু ওহো।
নাই ঘনালো দলবেদলের কোলাহলের মোহ।'

সভাপতিদের প্রতি এই সুনিশ্চিত উপদেশ নিছক রসালাপের উদ্দেশ্যেই নয়। তাঁর পিতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। মৃত্যুর পর স্মৃতিরক্ষার বাড়াবাড়ি যে মানুষকে সং সাজিয়ে তুলে অপমান করে এই ধরণের একটা মনোভাব নিয়ে মহর্ষি একদিন কবিকে যে কথা বলেছিলেন তা কবির ভাষাতেই শোনা যাক "সদর স্ট্রীটের বাড়িতে বাবামশায়ের তখন খুব অসুখ। কেউ ভাবেনি যে তিনি সেবারে সেরে উঠবেন। এই সময়ে আমাকে একদিন

ডেকে পাঠালেন। আমি কাছে যেতেই বললেন — আমি তোমাকে ডেকেছি, আমার একটা বিশেষ কথা তোমাকে বোলবার আছে। শান্তিনিকেতনে আমার কোন ছবি বা মূর্তি ঐরকম কিছু থাকে আমার তা ইচ্ছে নয়। তুমি নিজে রাখবে না। আর কাউকে রাখতেও দেবে না। আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি এর যেন অন্যথা না হয়। " (কবি-কথা, বিশ্বভারতী কার্তিক-পৌষ ১৩৫০) নিজেকে অমর করে তোলবার দুরাশায় সমসাময়িক কালের উন্মত্ত করতালি আমাদের কিছুক্ষণের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারে কিন্তু মহর্ষির নিরাসক্ত মন যেমন তাতে বিচলিত হতোনা কবির মনেও তার জন্য বিশেষ উল্লাসের ঢেউ দেখা যায়নি। একটি চিঠিতে তাই বলছেন "স্মরণসভায় যাঁরা বিলাপ করতেন সাহিত্য সভায় তাঁরা কটূক্তি করবেন।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা—শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩) বেদনাই রোমান্টিক মনোভাবের শেষকথা নয় — চিরপরিচিত প্রকৃতির কাছে সান্ত্বনা লাভের আশ্বাসও পেয়েছেন। যে ঝাউয়ের বনে গান বেজেছে এতদিন সেখানে কি পরেও আর গান জাগবেনা। তাই জনতার যে সমাবেশের প্রতি কবির একটুও বিশ্বাস নেই সেখানে তাঁর স্মৃতিটানাটানির কল্পিত ব্যঙ্গচিত্র তাঁকে বিমুখ করেছে — তাঁর মন শান্তি খুঁজছে অন্যত্র —

আমার স্মৃতি থাকনা ঢাকা আমার গীতি মাঝে
যেথানে ঐ ঝাউয়ের পাতা মর্জরিয়া বাজে।

১৩৩৪-এ উৎসব বা কবিতা কিছুই চোখে পড়েনি।

১৩৩৫-এ কবির জন্মদিনে তুলাদান হলো। উৎসব হলো বিচিত্রা ভবনে কবির ওজনের বই বিতরণ হলো নানা গ্রন্থাগারে ১৩৩৬-এ কবি চলেছেন জাপানে জাহাজের কাপ্তেন ও যাত্রীরা মিলে কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন: জাহাজে বসে একটি ইংরাজী কবিতা লিখলেন— a weary pilgrim (Modern review, 1929 August).

১৩৩৭-এ কবি আর শুধু লেখনীর কবি নেই। নূতন সৃষ্টির বৈচিত্র অজস্রধারে তখন তাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তিনি তখন চিত্রকর। প্যারীতে দুই বিদেশিনীর প্রাণপন চেষ্টায় প্রদর্শনী সার্থক হয়ে উঠেছে। কবির জন্মোৎসব হলো ফ্রান্সে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন— "ধরাতলে যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫শে বৈশাখে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর কবিত্ব সম্প্রতি আছন্ন তিনি এখন চিত্রকররূপে প্রকাশমান ..... এইবার আমার চৈতালী বর্ষশেষের ফসল সমুদ্রপারের ঘাটে সংগ্রহ হলো।"

১৩৩৮-এর পঁচিশে বৈশাখ সত্তর বছর পূর্ণ হলো কবির। তাঁর সংসারে যা সবচেয়ে বড় পরিচয় তার কথাই বল্লেন। বার বার বলেছেন যে তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নন, দেশনেতা নন — কবি। এই বছরের উৎসবের ভাষণেও সেই কথাই বল্লেন। —'একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানাজনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা —নই একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাইনে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।' সেকথা সত্য বলেছিলাম।" এই ভাষণের শেষাংশে বলছেন "এই ধুলো-মাটি ঘাসের মধ্য আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু আমি কবি।" (আত্মপরিচয় ৪নং প্রবন্ধ)। এবারের কবিতায় বল্লেন যে সংসারের সংঘাত, কর্মোদাম আজ স্তিমিত হোক, আজ যে দিন ফুরিয়ে এল "আমার রুদ্রের মালা রুদ্রাক্ষের অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে' — তাই শেষদিনগুলিতে বসুন্ধরা তার শ্যামল দাক্ষিণ্যভরা বাহু আমার

দিকে বাড়িয়ে দিক — পরিপূর্ণ আনন্দে যেন বলে যেতে পারি

'দূর করি সব কর্ম সব তর্ক সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি সকল দূরাশা,
বলে যাব আমি যাই রেখে যাই মোর ভালবাসা।'

১৩৩৯-এ কবি গেছেন পারস্য ভ্রমণে। নানা বৈচিত্র্যের সুধারসে জন্মদিনের পাত্র ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কখনো প্রধান হয় নিজের মনের চিন্তা কখনো প্রধান হয়ে ওঠে নানা দেশের সঙ্গস্মৃতি। জন্মদিনে ইরাণের উদ্দেশ্যে কবিতা লিখছেন। পৃথিবীর পথচলার ভৌগোলিক পাণ্ডাদের আধিপত্য তিনি মানেন নি কোনদিন। তাই তো এত সহজে নানা দেশ তাঁর কাছে নিজের দেশ হয়ে উঠেছে। তাই তো বলছেন—

ইরাণ তোমার সম্মানমালে	চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
নব গৌরব বহি নিজ ভালে	তোমার ললাটে পরাণু এ মোর শ্লোক
সার্থক হল কবির জন্মদিন	ইরাণের জয় হোক

১৩৪০-এ কবি আছেন দার্জিলিঙ-এ। আত্মশুদ্ধির জন্য মহাত্মা গান্ধী তখন অনশন করেছেন তাতেই মন একান্ত ভারাক্রান্ত। জন্মদিনের কবিতা এ বছরে নেই।

১৩৪১-এ কবি চলেছেন সিংহলে। জন্মদিন জাহাজেই কাটলো।

১৩৪২-এ কবির চুয়াত্তর বছর পূর্ণ হলো। ইতিপূর্বে কয়েকটা জন্মদিনের উপলক্ষে কোন সৃষ্টি নেই। এখন থেকে আবার কবির কাব্যস্রোত অজস্র ধারায় চলতে লাগলো। নানা তত্ত্ব, নানা অনুভূতির ভাবগভীর প্রকাশ কবিতাগুলিকে মহিমান্বিত করে তুললো। এই বছর কবিতা লিখলেন -- 'পঁচিশে বৈশাখ চলেছে'— জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে ধারা চলেছে তারই মধ্যে আমাদের জীবনের একটি একটি করে ছোট ছোট পালা সাঙ্গ হচ্ছে —

"ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা।"

জীবনের এক এক সময়ে এক এক রূপে আমরা কালের প্রসাদ পাই। তারপর সেই রূপ একদিন যায় মিলিয়ে। তখন আমাদেরই মধ্য থেকে একই নামের খোলস ভেঙ্গে আর একজনের জন্ম হয়। সে আমিই কিন্তু নতুন আমি।

একই তার নাম
কিন্তু সে বুঝি আর একজন।

যখন বালক ছিলেন তখন জীবনের একটা বিশেষ অবস্থা গেছে। তাকে আজ আর সত্য করে জানবার উপায় নেই। সে নেই নিজের স্বরূপ নেই কারো স্মৃতিতে। সেটা ছিল রূপকথার জগৎ।

"সে কয়দিনের জন্মদিন	কিছুকাল ছিল আলোতে
একটা দ্বীপ	কাল সমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।"

তার পর আর এক কালান্তরে পঁচিশে বৈশাখ দেখা দেয়। তখন তরুণ যৌবনের বাউল নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন বিশ্বের সৌন্দর্য নানা আভাসে ইঙ্গিতে কবির জীবনকে স্পর্শ করেছে। সেই কৈশোরের স্বপ্নমাখানো জন্মদিনগুলি অজানিতেই কবির উপর ছায়া ফেলে গেছে

তারা রেখে গেছে	প্রথম ঘুমভাঙ্গা প্রভাতে
আমার অজানিতে	নতুন ফোটা বেলফুলের মালা;
পঁচিশে বৈশাখের	ভোরের স্বপ্ন
	তারই গন্ধে ছিল বিহ্বল।

কৈশোরের দিন গেল, 'বাসন্তী রঙের পঁচিশে বৈশাখের রঙ করা প্রাচীরগুলো পড়লো ভেঙ্গে — কঠিন জীবনের পথে কবি এসে দাঁড়ালেন

সেই তৃণ বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে বাঁধানো রাজপথে।

একতারার সুর তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে বিচিত্র হয়ে বাজলো, কখনো এসেছে অবসাদ, তারপরেই এসেছে অমরাবতীর মর্তপ্রতিমা —যে সেবাকে সুন্দর করে, ভয়কে অপমানিত করে, জাগিয়ে তোলে দুঃসাহস। তারাই তাঁর জীবনকে প্রকাশ করেছে, নানা গানে নানা বাণীতে তাদের স্পর্শ রেখে গেছে। তারই মধ্যে আবার কোথায় বাজলো ভেরী, গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে সংগ্রামের সংঘাত উঠলো জেগে। নানা দিক থেকে যখন আঘাত এসেছে — যখন বিদ্বেষ অনুরাগ, ঈর্ষামৈত্রীতে জীবন আলোড়িত — তখন

'এই দুর্গমে,, এই বিরোধ সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।'

১৩৪৩-এ শান্তিনিকেতনে কবির জন্মোৎসব পালন হলো ১লা বৈশাখ। এ বছরে নববর্ষের দিনেই জন্মদিনের ভাষণ দিলেন। বেশ কয়েকটি কবিতা লিখলেন এ বছরের বৈশাখে যার প্রত্যেকটিকেই জন্মদিনের কবিতা বলা চলে। নিজের জীবন ও জন্মকে কেন্দ্র করেই এ কবিতাগুলির ভাবনার আবর্তন।

'বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে' কবিতাটি পত্রপুটের ১২নং কবিতা। জীবনে কি পাওয়া গেছে আর কি পাওয়া যায়নি তারই হিসাব নিকাশ। নিজের গূঢ়তম কামনার দ্বারা জীবনকে যেমন করে পেতে চেয়েছিলেন তার বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের আসর পড়ে আছে পিছনে আর সময় নেই ঘণ্টা গিয়েছে বেজে বেচাকেনার প্রহর ফুরিয়েছে। কবির এই বোধ স্পষ্ট হয়েছে যে জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে। সেই খোঁজা কবির জীবনে চাওয়া পাওয়ার বিচিত্র মালা হয়ে গাঁথা হয়েছে। আসন্ন বিদায়ের বেদনা নিয়ে কবি মানুষের চিরন্তন মহত্ত্বের উদ্দেশে প্রণাম রেখে যাচ্ছেন—

শুধু রেখে গেলেম নত মস্তকের প্রণাম	মর্তের অমরাবতী যার সৃষ্টি
মানবের হৃদয়সীন সেই বীরের উদ্দেশে	মৃত্যুর মূল্য দুঃখের দীপ্তিতে।

বুদ্ধি এবং মননের স্পর্শ সকলপ্রকার গীত উচ্ছ্বাসের মধ্যেও অনুভব করা যাচ্ছে।

পত্রপুটের তেরো নম্বর কবিতা — 'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্যপত্রপুট' — এ কবিতাটিকেও কবির জন্মদিনের কবিতা বললে অন্যায় হবে না। হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট জীবনের কোষে কোষে প্রাণরস সঞ্চয় করেছে, পৃথিবীর নানা আবেদন সেই হৃদয়ের ছড়ানো পাতাগুলির মধ্য দিয়ে জীবনের বোধ ও অনুভূতিকে প্রবল করেছে —

"বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনা।"

তারপরেই তো আসল চিন্তা। এই যে সংসারের সঙ্গে নানা যোগস্থাপনের দ্বারা কবির জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো তাকে এখন কার কাছে সমর্পণ করবেন। এই বিরাট জীবনের তিল তিল সঞ্চয় যে প্রবলপরিমাণ হয়ে উঠেছে কার হাতে দেওয়া যাবে তাকে — যে পত্রপুঞ্জে প্রাণশক্তি সঞ্চয় করেছে তারা তো আজ ঝরবার মুখে — 'আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের ঝরবার দিন এলো জানি।'

এরই সঙ্গে সঙ্গে এলো সেই কবিতা 'ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত।' (পত্রপুট ১৫) এখানেও জীবনে দুটি গভীর প্রবর্তনার কথা কবি জানালেন। প্রথম জন্মদিন তাঁর কাছে এনেছিল আলোর রহস্য আর সমস্ত জীবনের জাল বোনার পরে যে নূতন রহস্যের উদ্ঘাটন হলো তা হলো ভালবাসার রহস্য। তাই তো জীবনে শাস্ত্রবাঁধা দেবতা গ্রহণ করতে পারলেন না শেষপর্যন্ত। মন্দিরের রুদ্ধদ্বার থেকে তাঁর পূজা চলে গেল দিগন্তের দিকে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে। পুষ্পখচিত বনস্থলীতে—

"বালক ছিলেম যখন পেয়েছি আপন পুলক কম্পিত অন্তরে
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি আলোর মন্ত্র।"

আর শেষ কথা হলো জীবনে এই আলো আর ভালবাসার দ্বৈত প্রকাশ

'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য-আলোকের প্রকাশ
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য-ভালোবাসার অমৃত।"

১৩৪৪-এ তিনি গেছেন আলমোড়ায়। এবার ২২শে বৈশাখ জন্মদিনের তিনদিন আগেই 'জন্মদিন' (সেঁজুতি) কবিতা লিখেছেন। গত বছরের দার্শনিকতার ছোঁওয়া লাগানো কবিতাগুলির পর এবছরের জন্মদিনের কবিতা নিতান্তই সরল। এবার আবার মনে হলো যে কীর্তি খ্যাতির অন্তরালে জীবনের যে সহজ লীলাচঞ্চল ধারাটি চলেছে তাকে কেবলি ঢেকে ফেলি আমরা। জন্মদিনের তিথি মুখর হয়ে উঠে লোকটাকে ভুলিয়ে দেয়, তার নকল রূপখাড়া করে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেয় তাকে। খ্যাতি-সম্মানের বাধা তুলে লোকটিকে কেবলি দূরে সরায়—

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ, জন্মদিনের মুখর তিথি তারাই ভুলে থাকে,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ওই লোক। দোহাই ওগো তাদের দলে লও এ মানুষটাকে।

পৃথিবীকে তাঁর যে ভাল লেগেছে এই কথা বলা যেন তাঁর কিছুতেই শেষ হয়না। ছিন্নপত্রের পত্রগুচ্ছে এই মুগ্ধ বিস্ময়বোধের বহু উল্লেখ আছে। তাঁর প্রবীণ সুর দুর্জ্ঞেয় রহস্যের তত্ত্বউদ্ঘাটনে নয় এই ভাললাগায়। তাই এই কবিতার শেষে বলছেন—

সেই যে ভালো লাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে না যদি রয় নাই রহিল নাম,
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে এই মাটিতে রইলো তাহার বিস্মিত প্রণাম।"

শেষ জীবনের বহু কবিতা থেকে এই সুরের সাড়া পেতে পারি।

যুদ্ধের কালো ছায়া যে ক্রমেই জীবনের উপর গাঢ়তর হয়ে উঠছে একথা এই সময়ে স্পষ্ট হয়ে এলো সকলের কাছে। যারা যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হচ্ছিল তারা তাদের মনোভাব খুব গোপন রাখার চেষ্টা করেন নি। চীনের উপর জাপানের বর্বরতা, আফ্রিকায় শ্বেতসভ্যতার ব্যভিচার, ইংরাজ রাজশক্তির অসদাচরণ তাঁকে প্রতিদিন বিক্ষুব্ধ করেছে। তাঁর জীবনের শেষ

কয় বছরের কবিতায় তার প্রবল প্রকাশ দেখেছি আমরা। মানবতার চিরন্তন আদর্শের পক্ষে সেদিন বিশ্বের পশুশক্তির উন্মত্ত অহংকারের সামনে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। বহুদিন ধরেই নানা প্রবন্ধে তিনি একথা বলে আসছিলেন যে বস্তুর জড়পিণ্ড নিয়ে ইউরোপে যে রেষারেষি চলেছে এ শুধু উপনিবেশের প্রাণ শোষণ করেই তৃপ্ত হবেনা এর তৃষ্ণার্ত জিহ্বা একদিন নিজের ঘরের প্রাণটুকু লেহন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। কবির ৭৮ বছরের জন্মদিনে কবি এই দুর্যোগ দেখে লিখেছিলেন—"আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে একী মহামারী বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে, দেখে মন বীভৎতায় অভিভূত হলো। একদিকে কি অমানুষিক স্পর্ধা আর একদিকে কি অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনো বড় আদালত কোথাও দেখতে পাইনে।...মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মোৎসবে।" (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি) ১৩৪৫-এর পঁচিশে বৈশাখ কালিম্পং থেকে বেতারে পড়ে শোনালেন তাঁর জন্মদিনের কবিতা। বিশ্বমানবের হয়ে কবি ধিক্কার দিলেন তাঁদের যারা এই চরম দুর্যোগ ঘনিয়ে এনেছে। এই যুদ্ধ সজ্জার পরিণতি কত স্পষ্ট হয়েছিল তাঁর কাছে তারই চিহ্ন এই কবিতা। রবীন্দ্রনাথ শুধু কল্পনাবিলাসী, বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ নেই এই অভিযোগ মেকী বাস্তববাদীরা সুদীর্ঘকাল করেছেন। কিন্তু কবির জীবনের শেষ কয় বছরের আলোচনা এই কথাই প্রমাণ করবে যে কোন স্থবির চিন্তা বা কল্পনার ধূম্রজালে নিজেকে গোপন রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তিনিই পাশ্চাত্যসভ্যতার আত্মিক সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেছেন আবার তিনিই পাশ্চাত্যের যুদ্ধোদ্যমকে মানুষ জন্তুর হুহুংকার বলেছেন। ১৯৪০ সালে আবার তিনি কালিম্পং-এ যান। তখন তিনি যে পত্র লেখেন অমিয় চক্রবর্তীকে তাতে বলছেন "লুব্ধ অভ্যাসবশতঃ না খেয়ে যাঁদের চলেনা সেই মাংসাশীদের মধ্যে হনননীতি কিছুতেই থাকতে পারে না। বহুদিন থেকে এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্যে কারো বা কষের দিকে গোপনে দাঁতগুলি কি অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে চলেছিল, আজকের দিনে বড়ো করে বদন ব্যাদান করতেই ভীষণভাবে সেটা প্রকাশ পেল।" ১৩৪৫ সালের জন্মদিনে এই ভাবনাই কবিতায় রূপ পেলো। আসন্ন বিদায়ের পটভূমিকায় এই তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রকাশ শুধু তাঁরই মর্মবেদনাকে প্রকাশ করলোনা, পাঠক চিত্তকে ভাবতরঙ্গিত করে তুললো। কবির বুদ্ধি আর অনুভূতির নিবিড় মিলনে কাব্য সুন্দর হলো—পৃথিবী ছেড়ে যাবার বেদনা যেমন প্রবল তেমনি কঠিন মানসিক বলিষ্ঠতা অন্যায়কে ধিক্কার দেবার—ইংরেজী কবি দুঃখ করেছেন—Thus the world ends, not with a hang but with a whimper. রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদায়ের পরিণতি শুধু হতাশ্বাস ব্যর্থতার ছবি নয়—জীবন কোনদিনই তাঁর কাছে নিরর্থক নয়—তাই জীবনের ব্যভিচারকে ক্ষমা করার দুর্বলতাও তাঁর ছিল না কোনদিন।

'জন্মদিন' কবিতার অধিকাংশই নিজের কথা। মৃত্যু কাছে এসেছে, আজ যেন জীবন-মৃত্যুকে পাশাপাশি দেখে সমস্ত জীবনের একটানা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—

আজি মম জন্মদিন......... জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে
আজি আসিয়াছে কাছে দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম।

এতদিন যে তৃষ্ণা যে ক্ষুধা বেঁধে রেখেছিল বিশ্বের সঙ্গে সহস্র সম্বন্ধের বন্ধনে যাবার সময় সেই বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। কবি বুঝতে পারছেন, দৃষ্টির স্বচ্ছতা কমে আসছে, নিষ্প্রভ নেপথ্যের আহ্বান বর্তমানের সব অস্তিত্বকে ঢেকে ফেলছে। কিন্তু সব প্রয়োজনের বাঁধন কাটলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে মানুষ তাকে সম্মান না জানিয়ে তো পৃথিবীর উপায়

নেই। তাই বলছেন

তাই ক্রমে ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য পানে।.....কিন্তু জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।"

নিজের ভালবাসার উপর এতই বিশ্বাস যে অক্লেশে তিনি বলতে পেরেছেন যে দায় চুকলেও সংসারের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হবে না। দিনে দিনে যে জীর্ণতার স্তূপ উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে উঠেছে সেই কি জীবনের চরমতম সত্য। সকল আলো বিলুপ্ত করে সকল রূপ গোপন করে যে অমানিশার আবির্ভাব সেকি আর সব কিছুই ছাপিয়ে যাবে। তাই তাকে আবার বলতে হয়েছে 'জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর অনন্দস্বরূপ রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে।' যে ভালবাসা তাঁর জীবনের শেষ রহস্য সে কি কলুষিত অভিজ্ঞতার কাছে হার মানবে—জীবন কি শুধু ক্ষয়ক্ষতির সমষ্টিরূপেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবে। তাই কবি বলছেন যে 'আমার সে ভালবাসা সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট রবে' অভ্যাসের জড়তায় আজ সে যতই মলিন হোক মৃত্যুর পরপারে তার অমৃতরূপ জেগে উঠবে। তারপর প্রকাশ পেলো পরম প্রেমের অভিযান—যাবার দিনে যা কিছু নিয়েছি সব দিয়ে যাবো, যে দানে জীবন প্রতিদিন ভরে উঠেছে, নানা পুরস্কারে তার প্রতিমুহূর্ত সার্থক হয়েছে, আজ সবই ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হবে। তবু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে যেতে দ্বিধা নেই যে সংসারের কাছে অশেষ ঋণ রইলো—রবীন্দ্র কাব্যের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন কবির এই মনোভাব কত আন্তরিক.....

সে মানুষ হে ধরণী রিক্ততায় দৈনা নহে। তবু জেনো অবজ্ঞা করিনি
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ে তুমি গণি তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী
যা কিছু দিয়েছ তারে তোমার কর্মণীর যত সাজ, জানিয়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
তোমার পথের যে পাথেয়, তাহে সে পাবে না লাজ। অমৃতের পেয়েছি সন্ধান।

এতক্ষণ হলো নিজের কথা। তারপর আধুনিক কালের প্রসঙ্গে এলো—প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধের রোল উঠেছে—মানুষের হাতে মানুষের অপমানের চূড়ান্ত হতে আর দেরী নেই—সেদিন কবির সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছেন দীনবন্ধু এনড্রুস। তিনি তাঁর লেখায় জানিয়েছেন কেমন করে অতন্দ্র রাত্রিতে মানবসভ্যতার এই সদাজাগ্রত প্রহরী নিজের বুকের ব্যথার আলোটিকে জ্বালিয়ে রেখেছেন। এবারও তাই হলো কবি শুনতে পেলেন মানুষ জন্তুর হুহুংকার—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃপ্ত প্রতিবাদ—

"শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে ওঠে বাজি।"

১৯৪৬ এর পঁচিশে বৈশাখ কবি আছেন পুরীতে। সেখানে কবির জন্মোৎসব পালিত হলো বিপুল উৎসাহে। "সেদিন সার্কিট হাউসে উড়িষ্যার কয়েকটি মহিলা সমিতি সমবেতভাবে কবি সম্বর্ধনা করেন। পরদিন গভর্ণমেণ্ট পার্কে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে কবির জন্মোৎসব মহাআড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইল। বহু সহস্র লোক উদ্যানে জমায়েত হয়। জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতগণ কবির আয়ুবৃদ্ধি কামনা করিয়া প্রশস্তি পাঠ করেন। এইদিন এনড্রুস সাহেব পুরীতে ছিলেন। তিনি কবির জন্মদিন উপলক্ষে একটি কবিতা পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ সর্বশেষে তাঁহার ভাষণ দেন।" (রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাত মুখোপাধ্যায়— ৪র্থ খণ্ড)

এ বছরের কবিতা 'জন্মদিন' (নবজাতক) এ কবিতা একটি গভীর চিন্তাকে প্রকাশ করছে। বিদায়-বেদনার কথা নেই, পৃথিবীর প্রতি ভালবাসার কথা নেই, যে ভক্তের দল কবিকে দেবতা করেছে, যারা কবিকে নানারকম দৃষ্টিতে দেখছে তাদেরই কবি বলছেন, তোমাদের এই মনগড়া রবীন্দ্রনাথ কতক্ষণের। আজ যাকে নিয়ে এত ব্যস্ততা, এত আয়োজন, যাকে জেনেছি, চিনেছি বলে এত গর্ব আমাদের তাঁকে সত্যি সত্যি কতটা জেনেছি। যে রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী বলে আমাদের অহংকার তিনি কি সত্যি-ই পারবেন সংসারের কালরাত্রিকে মুছে ফেলতে।

কবি বলছেন তোমরা যাকে সৃষ্টি করছো সে একান্তই তোমার খণ্ডধারণার সৃষ্টি। তোমরা যাকে রবীন্দ্রনাথ বলে জেনেছ সে তো আমি নই।

"তোমরা রচিলে যারে নানা অলংকারে
তারে তো চিনিনে আমি, চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।"

সৃষ্টির রহস্য কে জেনেছে কবে। যাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করে আমাদের ভাললাগার ছাপ মেরে দিলুম, সৃষ্টিকর্তা যে রবীন্দ্রনাথকে গড়েছেন, তার কতটুকু সে। অনন্ত কাল ধরে কত সৃষ্টিই তো মানুষ দেখেছে, কতটুকুই বা বুঝেছে তার। তবু কি অহংকার—পুতুল তৈরী করে মনে করি সে পুতুল চিরস্থায়ী। স্রষ্টা যখন সৃষ্টি করেন তখন বিচিত্র রহস্যের যবনিকার গোপনে থাকেন তিনি। বাইরে থেকে গর্বিত মানুষ সেই সৃষ্টিকে বোঝবার আত্মপ্রসাদ লাভ করে—কি তার সম্বল—

খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া, আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
আর কল্পনার মায়া, অপরিচয়ের ভূমিকাতে।

কবি জানেন যে সৃষ্টি মাত্রেই একদিন 'কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।' অমরত্বের ভাণ আমাদের আছে কেবল ভাবছি যা এনেছি তা অমূল্য। তারপর হঠাৎ একদিন কালের বিস্তৃত প্রান্তরে দেখা গেল 'মুঠি কয় ধূলি রয় বাকী"।

সময় বিশেষে এ কথা সত্য—জনতার উল্লাসের অভ্যর্থনা যে কোন সম্ভাব্যতার সীমা রাখেনা তা প্রতিমুহূর্তেই তো জীবনে দেখছি। তাই আজকের জীবনের চেয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন অনেক সময় মন ভোলায় আমাদের। এ কবিতায় কবি সেই ব্যর্থ আশ্বাসকে মানেন নি। তার অর্থ এই নয় যে এই সংসারের আনন্দ প্রবাহকে তিনি অস্বীকার করছেন। প্রত্যেকটি খণ্ড তুচ্ছ বস্তুর মধ্যে তিনি জীবনের যে সামগ্রিক সত্যের দেখা পেয়েছেন এতো তাঁর কাব্যানুরাগীরা সকলেই জানেন। তাঁর বক্তব্য এই যে ভালো লাগার জন্য সংসার যা দিয়েছে এই তো যথেষ্ট—কেন সৃষ্টির সব তত্ত্ব জেনেছি এই অহংকার।

১৩৪৭-এর বৈশাখ এলো মংপুতে। কবি গেছেন মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করে সেখানে। পাহাড়ীদের মধ্যে যে উৎসব হলো তার সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী বলছেন—"পঁচিশে বৈশাখের দুতিনদিন আগে একটা রবিবারে এখানে উৎসবের বন্দোবস্ত হলো। সকাল বেলায় দশটার সময় স্নান করে কালো জামা কালো রংএর জুবো পরে বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধ-মূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ বৃদ্ধ স্তোত্র পাঠ করলেন। উনি উপনিষদ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেই দিন দুপুরবেলা জন্মদিন বলে তিনটে কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে বোধ-বুদ্ধের কথা ছিল। বিকেল বেলায় দলে দলে সবাই আসতে লাগলো—আমাদের পাহাড়ী দরিদ্র প্রতিবেশী সানাই বাজাতে লাগলো, গেরুয়া রংএর জামার উপর মাল্যচন্দন ভূষিত আশ্চর্য

স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগলো। ঠেলা চেয়ারে করে বাড়ীর পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, দলে দলে পাহাড়ীরা প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিলো। প্রত্যেকটি লোক শিশু বৃদ্ধ সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে। ওরা যে এমন করে ফুল দিতে জানে তা আগে কখনো মনে করিনি। তিব্বতীরা পরালো ধর্দা গাছের সুতোয় বোনা স্কার্ফ, যা ওরা লামাদের পরায়। ফুলে প্রায় আবৃত হয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে শিলাতলে এসে বসলেন, তিব্বতী আর ভুটানীরা সুরু করলে তাদের জংলী তাণ্ডব নাচ।"

সেইদিন তিনটি কবিতা লিখলেন 'জীবনের আশীর্বর্ষে প্রবেশিনু যবে' 'কালপ্রান্তে মোর জন্মদিনে' আর 'অপরাহ্নে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে' —পরদিন খবর পেলেন ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে—তখন লিখলেন 'আজি জন্মবাসরের বক্ষভেদ করি।' প্রথম কবিতাটি নিজের কথা, দ্বিতীয়টি বৃদ্ধ বন্দনার, তৃতীয়টি পাহাড়িয়াদের শ্রদ্ধার স্বীকৃতি। প্রথমটিতে কবি বলছেন যে একদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে জন্ম নিলো পৃথিবী, তার উপরে প্রাণের প্রকাশ শাখায়িত হল রূপে রূপান্তরে 'উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়।' সেই অসম্পূর্ণ প্রাণ প্রকাশকে বহুকাল বধ্য হয়ে থাকতে হলো পশুলোকের মধ্যে। তারও বহুকাল পরে 'মন্থরগমনে এলো মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে।'

তার চেতনার স্পর্শে নূতন নূতন আলো জ্বলে উঠলো, 'নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী।' পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে চৈতন্যের প্রকাশ দেখা যেতে লাগলো ধীরে ধীরে। এই পৃথিবীর গতির ভিতরে যে রহস্য, যে প্রবর্তনা তারই রূপ উদ্ঘাটনে কবি আশীর্বছর চেষ্টা করেছেন—

"আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যে প্রদক্ষিণ
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।"

এই গৌরব প্রত্যেক স্রষ্টার। সাধারণ যারা, তারা যা দেখে তার অতিরিক্ত রহস্যের খোঁজ রাখেনা। তাই ছোটখাটো সবকিছুই যে রহস্যের আবরণে ঘেরা এ বোধই বা কজনের আছে। যাঁরা সেই রহস্যের যবনিকা তোলার কাজ পেয়েছেন তাঁরা তাই পুরস্কার পেয়েছেন সেই কাজের মধ্যে।

জন্মদিনের ৬নং কবিতায় সেই বৃদ্ধ ভক্তকে স্মরণ করলেন যিনি তাঁর জন্যে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন। শ্রদ্ধার অকুণ্ঠিত অর্ঘকে কবি তাঁর কাব্যের আশীর্বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। শুধু তত্ত্ব বা পূর্বস্মৃতি বা বিচ্ছেদবেদনায় যে জন্মদিনের কবিতা এতদিন রূপলাভ করেছিল, তার মধ্যে এবার ব্যক্তি এলো। কিন্তু সেই ব্যক্তিও কবির চিত্তে নূতন ভাবের সুর লাগিয়ে দিলে—মন ব্যাকুল হলো বুদ্ধবন্দনায়। আশীবছরের প্রান্তে পাহাড়ের বুদ্ধবন্দনা তাঁকে স্মরণ করালো যে তাঁর সাধনার পুণ্যফল আমরাও পেয়েছি। নিজের জীবন শুধু নিজের কৃতিত্বের চারপাশেই আবর্তিত হচ্ছে না—যা কিছু সুফল অর্জিত হয়েছে এই পৃথিবীর আমরা তার সব কিছুরই অংশ পাই।

"প্রবেশি মানসলোকে আশীর্বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।"

জন্মদিনের ৭নং কবিতায় পাহাড়িয়াদের কথা, যাদের নাচ, যাদের অভ্যর্থনা কবির ভাল লেগেছে তারা সকলেই তাঁকে ফুল উপহার দিয়েছে। সেই ফুল যুগযুগান্তের তপস্যাতপ্ত পৃথিবীর বুকে শান্তির চিহ্ন। কবির কাছে এ শুধু একটি দিনের সম্মান নয়—এই ফুল যেন অপেক্ষা করে ছিল কবে সে মানুষের জন্মদিনে সে উপহার হয়ে সত্য হয়ে উঠবে। বিশ্বের যা কিছু

সুন্দর সে যেন মানুষকে প্রণাম জানাচ্ছে। সেই নমস্কার গ্রহণেই কবি সেই সম্মান পেলেন যা নক্ষত্র-খচিত মহাকাশের জ্যোতিঃ সম্পদের মধ্যেও কেউ কখনো পায় নি—

ধরণী লভিয়াছিল কোন ক্ষণে
প্রস্তর আসনে বসি
বহুযুগ বহিতপ্ত তপস্যার বরে এই বর
এ পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিন উৎসর্গ করিবে আশা করি।
সেই বর মানুষের সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।

সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে যে কবিতা লিখলেন তার মধ্যে মৃত্যুর গৌরব ঘোষিত হলো। জীবনের সায়াহ্নবেলায় মৃত্যুর দীপ্তি এসে লাগলো মনে, অস্তোন্মুখ সূর্য যেমন রাত্রির মুখশ্রীকে স্বর্ণময়ী করে দেয় তেমনি জীবন মৃত্যুর স্পর্শে পশ্চিমপ্রান্তে এসেও দীপ্ত হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বে জন্মদিনের একটি কবিতায় কবি জীবনমৃত্যুকে একসূত্রে বাঁধা দেখতে চেয়েছেন। আজ মৃত্যুর আঘাতে সেই সুর আবার বাজলো। যে অখণ্ডজীবনের সাধনা তাঁর সারাজীবনের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রণোদিত করেছে তাকেই যেন জন্মমৃত্যুর মিলিত সীমায় কবি দেখতে পেলেন—

আলোকে তাহার দেখা দিল সে মহিমা উদ্ঘাটিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
অখণ্ড জীবন যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে। কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে॥

এই সময় জন্মদিনের তারিখটিতে ছাড়াও তিনি অন্যদিনে যে সব কবিতা লিখেছেন তাকেও জন্মদিনের কবিতা বলা যায়। তাঁর মনে শেষ বছরটিতে কেবল একটি কথাই নানাভাবে ঘুরে ঘুরে এসেছে, তা হলো বিদায়ের সময় সকলের সঙ্গে নিজের প্রীতির বন্ধনকে আর একবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে যাই। অনেকদিন আগে লিখেছিলেন 'যাবার বেলায় এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই, যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।' সেই কথা শেষ বছরগুলিতে বারবার বলেছেন; পৃথিবীর তুচ্ছতম বস্তুগুলিকেও কি ভালবাসার চোখেই তিনি দেখেছিলেন। আজ যাত্রা যখন খুব নিকট তখন সব তত্ত্ব ভুলে সব দার্শনিকতার ছোঁওয়া এড়িয়ে তিনি প্রাণভরে একটি কথা বললেন—মানুষের ভালবাসা আর আশীর্বাদ নিয়ে গেলুম। ফলদানি থেকে আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ে একে একে কিন্তু সেখানেও তো মৃত্যুর ব্যঙ্গ নেই—বিদায়ের সকরুণ স্পর্শ আছে কিন্তু ভর্ৎসনা নেই। তেমনি কবি বলছেন —

জন্মদিন মৃত্যুদিন দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে.....
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান (জন্মদিনে,২৬)

নিজের জীবনকে কত বিচিত্র রূপে প্রতিফলিত করে কবি দেখেছেন—সেই নব রূপায়ণেই তাঁর আনন্দ। নিজের জীবন যেন একটা নদী, নানা গিরিশিখরের দান নিয়ে সে চলেছে 'পূর্বপশ্চিমের নানা গীতস্রোতজালে ঘেরা তার স্বপ্ন জাগরণ।' যেখানেই কবির আসন পাতা হয়েছে, মিলেছে অঞ্জলিভরা দান—পথে পথে অবারিত আতিথ্য মিলেছে আর এক একটি করে পঁচিশে বৈশাখ পূর্ণ হতে পূর্ণতর হয়ে উঠেছে

"আমি ভ্রাত্য আমি পথচারী,
অবারিত আতিথ্যের অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবসের থালি। (জন্মদিনে২৮)

'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের প্রায় অধিকাংশ কবিতাই জন্মদিনের কবিতা। মংপুতে যে জন্মদিন পালন করলেন তারই স্মরণে জন্মদিনের প্রথম কবিতাটি লিখেছেন। সেদিন 'হিমাদ্রির হিমশুভ্র

পেলব ললাটে' আলোর চন্দনরেখা দেখা দিল সেই বিরাট পর্বত স্মরণ করিয়ে দিল—'যে মহা-দূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মাঝখানে—তাকেই। সেই দূরত্বের অনুভব প্রবল হয়ে উঠছে। নিজেকে মনে হচ্ছে 'অলক্ষ্যপথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।'

দ্বিতীয় কবিতায় অসম্পূর্ণ প্রকাশের বেদনা। আশীবছর ধরে কত রূপ কত রঙের লীলায় জীবন উজ্জ্বল হলো কিন্তু নিজেকে তো সম্পূর্ণ করে তবু প্রকাশ করা হলো না। একটি একটি করে জন্মদিন আসে কিছু কিছু করে প্রকাশ হয় কিন্তু তবু যা অব্যক্ত যা অজানা তার অংশটাই বেশী—তারই প্লাবনে সত্তা ডুবে আছে।—

এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন আবরণ
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপন অগোচর। (জন্মদিনে ২)

আর একটি কবিতায় কবির শারীরিক ক্লান্তির ইঙ্গিত আছে। বসন্ত এসেছে পলাশবনে গাছের শাখায় শাখায় ফুলের ভার ফুটে উঠেছে। কিন্তু উৎসবে যোগ দিতে পারলেন না কবি। প্রত্যেক জন্মদিনের আগে বসন্তের এই নবোচ্ছ্বাস তাঁর মন পূর্ণ করে দিয়েছে কিন্তু এবারে (১৩৪৭) হলোনা—এবার যাবার সময় বিরহবেদনায় মনের পাত্র ভরেছে—তারই মধ্যে কবি দেখতে পাচ্ছেন নতুন জন্মদিন আসছে—

জানি জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে। (জন্মদিনে ৪)

শেষ জন্মদিন এলো ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৮। ১৩২৯-এ যে পঁচিশে বৈশাখ কবিতা লিখেছিলেন তাকেই বদলে সুর দিয়ে নতুন গান করলেন। আর লিখলেন একটি কবিতা, শেষ জন্মদিনের কবিতা যাতে তাঁর শেষ কামনা প্রকাশ পেয়েছে—

আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্তের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

ম্যাজেভিয়েস্কী

ফেঁয়ে জেন্‌ভিয়েভ্‌-এ প্রতিদিন দুপুর ও সন্ধ্যের সময় স্বল্প মূল্যে ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীর ভিড় লেগে যেত তার মধ্যে সাদা, কাল, বাদামী, হল্‌দে মানুষের ভেদাভেদের বালাই ছিল না। হৃদ্যতা ভরা করমর্দন অচেনাকে এই মিলনমন্দিরে চেনা করে দিত বিনা আড়ম্বরে এবং দু' এক দিনের আলাপের পরেই "মো ভিয়ো কি মা ভিয়েই" ব'লে নিকট বন্ধুত্বের সম্বোধন এনে দিত মিত্রতার সান্নিধ্য। শ্লাভ জাতীয় সবকটি বিশেষণকে চেহারা ও আচরণে পরিস্ফুট করে এই ফেঁয়েতে আসতেন ব্রনিস্‌লাভ্‌ মাজেভিয়েস্কী। তাঁকে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বেশ ব্যগ্র দেখা যেত। কিন্তু অপর পক্ষ তাঁর অগ্রসরের আভাস পেলেই কোন অছিলায় স'রে পড়বার চেষ্টা করত। ভদ্রলোক এই আন্তর্জাতিক আদর্শ ছাত্র সম্মেলনে কেন যেন অপাংক্তেয় তার কারণ, প্রথমে বুঝিনি। একদিন তিনি আমাকে "আমি মাজোভিয়েস্কি, আপনি নিশ্চয়ই ভারতীয়।— আপনার নাম বল্‌লে বাধিত হব" ব'লে কর-মর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন। আলাপের পর তিনি আমার পাশে বসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। সেগুলি তুবড়ি বিস্ফোরণের বেগে আসতে লাগল এবং ততোধিক বেগে আসতে লাগল সদা লালাসিক্ত মুখের ছিটে ফোঁটা। দূরত্ব বজায় রেখে নিজেকে সেই মুখ-নিসৃত বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার চেষ্টাও বৃথা কারণ প্রশ্নের গুরুত্ব ও আগ্রহকে জোরালো করতে তিনি ঝুঁকে প'ড়ে আরও কাছে মুখ নিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, সেই মুখ বিবর থেকে একটা দুঃসহ গন্ধ আসছিল — সেটা ফরাসী সুরার স্থায়ী খোসবু কিংবা হ্যালিটোসিস নির্ণয় করার আগে তার গ্যাসে দম বন্ধ হবার উপক্রম। এ অভিজ্ঞতা অবশ্য আমাদের দেশে খুব সাধারণভাবে হয়ে থাকে। সাধারণত এই দুর্গন্ধ ভরা মুখের অধিকারীরা, অন্যে সেই দুঃসহ গ্যাসের পরিধির মধ্যে পড়ে কষ্ট পাচ্ছেন কি না, সে বিষয়ে হ'য়ে থাকেন সম্পূর্ণ উদাসীন কারণ নিজের নাসিকা সেই গন্ধে অভিভূত হয় না ব'লে। ওদেশে শারীরিক কোন ত্রুটির কথা কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে জানান অসৌজন্য। তবুও ম্যাজোভিয়েস্কীকে অনুরোধ করলাম যে যদি তিনি আমার পরিচয়কে দীর্ঘায়ু করতে চান, তাহলে তাঁকে কথা বলার সময় মুখ দূরে রেখে একটা ব্যবধান বজায় রাখতে হবে। তিনি তো প্রথমে এই আকস্মিক রূঢ়তায় 'থ' হ'য়ে গেলেন। পরে হেসে বল্‌লেন 'জান হে, তোমার মতন এমন স্পষ্টবাদী লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। এখন আমি বুঝি, কি জন্যে সবাই আমায় এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু ম্যাজেভিয়েস্কীর এই একটি ত্রুটিকে শুধু যে লোকে এড়াবার চেষ্টা করত তা নয়। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার বেশ কতকগুলি অভিধান থাকত এবং নানান ভাষা-ভাষী ছাত্র-ছাত্রী-দের সঙ্গে তিনি তাদের ভাষায় আলাপের চেষ্টা করতেন। কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে "এ্যাঁ মম সিল্‌ ভুপ্লে" ব'লে তাঁদের থামিয়ে না-বোঝা কথার অর্থ অভিধান খুলে দেখে নিয়ে তারপর শব্দটিকে দু'তিন বার আবৃত্তি করে বলতেন "কন্‌তিনিউয়ে" অর্থাৎ "এখন ব'লে যাও।" এরই জন্যে ছাত্রছাত্রী মহলে তাঁর নামকরণ হয়েছিল "ম্যঁসিয় লো ডিকসনেয়ার্‌।"

ভদ্রলোকের আরও একটি দুর্বলতা ছিল সুন্দরী ছাত্রী বা যুবতী দেখলে তার সঙ্গে

আলাপের চেষ্টা। তিনি ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু' একটি ডক্টরেট উপাধি অর্জন ক'রেছেন এবং পারীর ফাকুলতে দু দ্রোয়ায় তিনি 'ইকনমিক পলিতিক' সম্বন্ধে গবেষণা করে আর একটি ডক্টরেট অর্জনের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। তাঁর নিমন্ত্রণে একদিন ছ' তলার উপরে চিলে কোঠায় এ্যাটিক ঘরে গিয়ে প্রথমে নজরে পড়ল দিভান-এর পাশের দেওয়ালে লাগান অসংখ্য কিশোরী ও যুবতীদের ফটোগ্রাফ। জিজ্ঞাসা করা অনুচিত, তবুও বন্ধুবরের কোনদিন এদের তাঁর হারেমে রাখবার ইচ্ছা ছিল কিনা জানতে চাইলাম। তিনি বল্‌লেন এদের অনেকেই আমি চিনি না। রাস্তায় দেখা হ'লে তাঁদের রূপমুগ্ধ হ'য়ে আমি শুধু একটি ফটো তোলবার অনুমতি ভিক্ষা ক'রে এই সংগ্রহকে তৈরী করেছি।' তারপরে তিনি এই ছায়াগুলির অধিকারিণীরা কে কোন্ দেশীয় তার পরিচয় দিতে লাগলেন। ঘরের এক কোণে ছিল একটি বেহালা এবং ষ্ট্যাণ্ডের উপর রাখা মিউজিক স্কোরের কয়েকটি সীট্। কাছে গিয়ে দেখলাম সেটি মোৎসার্ত-এর "ভায়েলিন কনচারতো।" তিনি দুটি বিরাট পোর্‌সেলিনের বাটিতে গরম জল ঢেলে ঝাঁঝরা-করা বড় মাদুলির মতো চেনে বাঁধা একটি এ্যালুমিনিয়ামের আধারে চা-ভরে সেই জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে নেড়ে চেড়ে চায়ের সুরুয়া বানিয়ে তাতে আধখানা পাতি লেবুর রস নিংড়ে বললেন "চিনি সংযোগের প্রয়োজন বোধ করলে, নিজেকে সাহায্য করবে।" কাছে একটি কাগজের বাক্‌সয় মিনিয়েচার সাইজের ফরাসী চিনির ইট পাঁজার মতো সাজান ছিল। তারই গোটা কয়েক মিশিয়ে কোনমতে এই চা-কে পান করা গেল।

আলাপ ঘনীভূত হ'লে জানলাম ম্যাজোভিয়েস্কী হচ্ছেন উৎকট রকমের জ্ঞানপিপাসু। ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্সে এক ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তেবাসীর সাক্ষাৎ মেলে। এঁরা বিদ্যায়তনে প্রবেশের পর থেকেই গবেষণায় এমন মেতে যান যে বাইরের সমাজের সঙ্গে তাদের সংযোগ ছোট হ'তে হ'তে তাঁরা তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বিদ্যায়তনের পরিধির মধ্যেই তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন আর বাইরে এলেই তাঁদের ভাবে, আচরণে, মনে হয় যেন বাড়ীর জঙ্গলে তাঁরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন আর অন্য পেশার লোকেদের আলাপ পরিচয়ের হিংস্র আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। একটি গবেষণা বা থিসিস্ শেষ হওয়ার আগে বিদ্যায়তন ছেড়ে যাবার ভয়ে তাঁরা আর একটি গবেষণা বা থিসিস্ লেখার ব্যবস্থা করে ফেলেন। যদি বিদ্যায়তনে অধ্যাপনার কাজ জোটে তা হলে তো তাদের সর্বোদ্ধার হয়ে যায়, না হ'লে কোন না কোন অছিলায় তাঁরা থেকে যান আজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বুঝলাম, মাজোভিয়েস্কী এরই একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। সামান্যমাত্র বৃত্তি পেয়ে রাত্রে কোন ব্যবসায়ীর অনুবাদকের কাজ করে — কোন মতে তাঁর বাস আহারের সংস্থান হয়ে যায়। একদিকে যেমন তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, অপরদিকে তাঁর তেমনি ছিল মেয়েদের ব্যাপারে পাগলামী। এ যেন সম্পূর্ণ দুই বিভিন্ন ব্যক্তির এক অদ্ভুতভাবে পরিস্ফুট ডাইকোটমি। তিনি যে এত ইউরোপীয় ভাষা কেবল অভিধানের সাহায্যে এবং প্রশ্নোত্তরকারী লোকেদের বিরক্তি কুড়িয়ে আয়ত্ত করে ছিলেন তার মূলে ছিল সেই ভাষাভাষী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হ'লে তাদের মাতৃ ভাষায় মধুর সম্ভাষণ অকৃত্রিম ভাবে করতে পারবেন বলে। তাঁর কথার বিষয় বস্ত ঘুরে ফিরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মেয়েদের শারীরিক রূপ ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনায় দাঁড়াত। একদিন মাজোভিয়েস্কির সঙ্গে এক সঙ্গীতালয়ে যেতে মেট্রো ট্রেনে উঠতেই তিনি বল্‌লেন 'এ কামরায় যাব না অন্যতে চল। সে কামরায় অনেক আসন খালি থাকা সত্ত্বেও তিনি জিদ ক'রে উঠলেন অন্য কামরায় যদিও সেটায় ছিল ভীষণ ভিড়। এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বল্‌লেন। ও কামরায় দেখলাম একটিও মহিলা বসেনি। একটি মহিলার মুখ যে যানবাহনে দেখা যায় না, তাতে চ'ড়ে গেলে আমার মনে হয় যেন আমি শবদেহবাহী গাড়ীতে বসে আছি। এর চেয়ে ভীড়ে ভরা গাড়ীতে দাঁড়িয়ে যাওয়া অনেক ভাল কারণ মেয়ে যাত্রীদের সুন্দর মুখগুলি ফুল দেখার মত নিরীক্ষণ করে যাত্রার বিরক্তি ও ক্লেশকে ভুলে যাওয়া যেতে পারে। তাঁর এসব উক্তি শুনে মনে হবে যেন তিনি একটি উৎকট রকমের ডন্‌জুয়ান। কিন্তু বাস্তবে তিনি মেয়েদের সান্নিধ্যে রীতিমত লাজুক হয়ে সামাজিক শিষ্টাচারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাতেন এবং সাহস ক'রে বড়জোর তাদের সু শ্রীও সুসজ্জার দু' একটা মামুলী প্রশংসাবাদ ছাড়া আর কিছু বিশেষ রোমাণ্টিক বলতে অক্ষম ছিলেন। তাঁর আচরণ দেখে মনে হ'ত না যে, রোমান্স-অন্বেষী যুবকের প্রেমসঞ্চারি অগ্রসর; এ যেন, কোন বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত খুড়ো কি জ্যেঠা, ভাইঝির কাছে কুশলাদি সংবাদ নিচ্ছেন।

তখন নভেম্বরের শেষ। সিতে ইউনিভারসিতে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে যেতে আমি ও ম্যাজেভিয়েস্কী মোপারনাসে-এ মিলিত হয়ে পদব্রজে যাত্রা শুরু করেছি। সেই বিশাল চওড়া বুল্‌ভার আর তার অতি প্রশস্ত ফুটপাতে অনেক পথচারীর ভিড়কেও বেশ পাতলা দেখায়। হঠাৎ আমাদের সামনে ছেঁড়া পোষাক পরা একটি বৃদ্ধা অতি সঙ্কোচে হাত চিতিয়ে আমার অচেনা ভাষায় কি একটা বল্‌লে। তার পোষাকের কাট্‌ছাট্ ফরাসীনীদের অঙ্গ বস্ত্রের ঢং থেকে যে বেশ অন্য রকমের তা এক পলকের দৃষ্টিতেই বোঝা যাচ্ছিল। ফরাসী দেশে ভিখারীর হাত পেতে ভিক্ষে চাওয়াটা খুব বিরল ছিল না। কিন্তু এই বৃদ্ধাটিকে সেই জাতীয় ভিখারী মনে হ'ল না। ম্যাজেভিয়েস্কী তাঁর ভাষাতেই কি একটা বলতে সে তাঁর হাত ধ'রে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। বন্ধু সংক্ষেপে জানালেন যে মহিলাটি অন্তর্বিপ্লবে বিধ্বস্ত স্পেন থেকে পলাতকের গড্‌ডালিকাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এসে পড়েছেন এই বিলাস ও সুখানন্দে আপ্লুত পারী নগরীতে। ফরাসী ভাষা না জানায় দিশেহারা মহিলা দু' দিন যাবৎ না পেয়েছেন আহার্য না পেয়েছেন আশ্রয়। ভিক্ষায় অনভ্যস্থা তিনি, আনাড়ির মতো হাত পাতায় পথচারীদের করুণা জাগাতে অক্ষম হয়েছেন এবং দেশীয় ভাষা না জানায়, কাউকে জানাতে পারেন নি তাঁর কি দুর্দশা।

বৃদ্ধাকে আমরা একটি কাফেতে বসিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করলাম। খাওয়ার শেষে যখন তাঁকে কফি দেওয়া হল তিনি কাপটি অতি সন্তর্পণে নাকের কাছে তুলে তার তীব্র গন্ধকে বেশ একটা দীর্ঘ আঘ্রাণ করে চোখ বুজিয়ে বল্‌লেন 'আঃ! ক্যাফে।' যেন কতদিনের 'আকাঙ্ক্ষার দুষ্প্রাপ্য পাণীয় আজ তাঁর হস্তগত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু করে সেই অমৃত পাণীয়ের আস্বাদনকে যত দীর্ঘজীবি করা যায় তার চেষ্টা করতে লাগলেন। মাজোভিয়েস্কি ভাঙ্গা স্প্যানিশ ভাষায় তার সঙ্গে আলাপ করে জানালেন যে বার্সিলেনোয় বোমা বর্ষণের পর শহর ও শহরতলীর লোকেরা ভয়বিহ্বল হয়ে পালাতে শুরু করে এবং তাদের লক্ষ্য ছিল ফরাসী সীমান্ত। একটা বিরাট বিভীষিকার সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের প্রথম প্রচেষ্টা। প্রথমে একটা বিশৃংখল সন্ত্রস্ত জন সমষ্টি পথে চলতে ঘটনাচক্রে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছিল সীমান্ত অতিক্রম করে ফ্রান্সে কিন্তু রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছতে আবার সে জমাট বাঁধা রেফুজির দলে ধরেছিল ভাঙ্গন। সেই ভাঙ্গনের একটা ভাঙ্গা টুকরো ছিল এই বৃদ্ধা। এক বিভীষিকার করালগ্রাস থেকে পালিয়ে এসে, আর এক ভয়ংকরের সামনে পড়েছে।

পরবাসী

মানসী দাশগুপ্ত

প্রথম পক্ষের বউ মরে যাবার পরে ছেলেকে কিছুতেই দ্বিতীয়বার বিয়েয় বসাতে পারছিলনা রাণী। এই এক বছর কাল সম্বৎসর চেষ্টা করেও না। রাগ করে সে ছেলেকে বলল, "তবে বে তুই করবিনি। পুতির মুখ দেখা কি আর আমার এ অদেষ্টে আছে, ও নেইকো। তবে জীবন-ভোর খেটে মরলুম কিসের তরে পরের দোরে দোরে তুই বল? একটুকু দুটুক করে যা জমালুম সব বিথা বল?"

রাজা বলল, "ঢেঁকি ধান ভানে আপন স্বভাব। পরের দোরে দোরে গতর খোয়ানো ও হলো গিয়ে তোমার ওগ। আমি কি করব?"

পাড়ার লোকে হেসে বলে, "আনি, তুই হলি গে আজার আনি। তুই ছেলের নাম রাখবি ষোবরাজ না আখতে গোঁল আজা। তোর অঁচল সে ছাড়বে কেনে?"

"মরণ তোদের মরণ" — বলে রাণী শহরে চলে যায়। কিন্তু আশা ছাড়েনা। তার কত-দিনের আশা। তার এককড়ার ধন রাজা সাঁতাই রাজা হয়ে বসবে জোত জমা ঘর সংসার ভরা ভর্তি নিয়ে। বউ সমাহ করবে কত। সেও তখন গতর গুটিয়ে এসে নাতি কোলে নিয়ে বসবে। ছড়া শোনাবে। সেও জানে। কত জানে। এই পঁচিশ বছর ধরে এ দুয়োর ও দুয়োর — কত ছেলে মানুষ হলো তার কোলে। শহুরে সব মা। তারা কি মা? ছেলে বিয়েয় বিয়োতে হয় বলে। তারপর ছেলে রইল ছেলের মনে। মেয়েতে মরদে আজ সিনেমা, কাল বায়স্কোপ, পরশু নেমন্তন্ন — ছেলে নিয়ে বসতে এই রাণী। সে হলো পরের ছানা। নাওয়াও ধোওয়াও খাওয়াও, দাওয়াও, বাস, যার ছেলে তার কোলে তুলে দাও। সে ধরুক আর না ধরুক। ছুঁক বা না ছুঁয়ে দেখুক। সেই হলো মা। নিজের ছেলেকে কি সে আদর যত্ন করতে পেরেছে; তা করতে চাইলে তাকে আর বাঁচিয়ে রাখতে হতো না। কড়ি দিত কে? গতরে খেটেছে, টাকা পাঠিয়েছে কাড়ি কাড়ি — তবে মাসী বলে মাসী পিসী বলে পিসী। তাই বলে এখনো কি সে আপনার ঘরে আপনার দোরে আপনার রক্তের দলা নিয়ে নেড়ে চেড়ে মানুষ করে তুলবেনা? ছেলের অবিচারে তার আক্ষেপের শেষ থাকেনা। বউটাও তেমনি বউ। খরচ পত্তর করে দেখেশুনে কত বিবেচনা ব্যবস্থার পর ঘরে বউ আনা। দু'দিনের জ্বরে অমনি পট করে সেই বউ এই নেই। এখন আরো কত জপিয়ে তপিয়ে যদি বা বউ আনতে পারে রাণী। অমনি কি তার ওপর মন পড়বে চট করে ছেলের? বুঝতে আর রাণীর বাকি নেই ছেলেকে। বরাবরই যে অমনি রাজু। যে পুতুলটা ভাগলে সেইটেই চাই। নতুন যা দাও তা দাও মন আর ওঠেনা। নতুন বউ এলেও যে কত চেষ্টায় রাণীকে থাকতে হবে ছেলেকে তার দিকে টানার জন্য ছেলেকে ঘরনাগাী করার জন্যে — ভাবতে ভাবতে মনিব বাড়ির ময়লা বিছানায় রাণীর চোখে ঘুম আসে। বিয়ে করবেনা, বললেই অমনি হল কিনা? তার তাগা তাবিচ সব নতুন ভেগে গড়িয়ে রেখে দিয়েছে কি রাণী শুধশুধি?

গঙ্গা পুজোর সময় দিয়ে জয়নগরে গেল রাণী দু দিনের ছুটিতে। পোঁছল শেষ বিকেলটাতে। হরি বারুইদের থামার ঘরখানার পাশ দিয়ে সূর্যের তেজ তেরছা হয়ে পড়ছে এসে, রাস্তার ছোট অবাড়ত নরকেল গাছটা লম্বা ছায়ায় হেলে পড়েছে। দেখতে

দেখতে ঐ হলো ঘোষেদের বাথান। বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে গলিটায় পড়তে যাবে কি না যাবে, ঘোষেদের বড় বউ ডেকে সাড়া নিলে, "হন-হনিয়ে এলে যে আজুর মা, ব্যাটার বে নাকি?"

রাণীর হাঁপ ধরেছিল। অনেকটা পথ। একেবারে গিয়ে নিজের দাওয়ায় জিরোতে পারলে হতো ভাল। চলতে চলতে বললে, "তার ঠেক কি? হলেই হয়।"

ঘোষ বউ মুচকি হেসে বাছুরটার গলার দড়ি মুক্ত করে দিয়ে ভিন্ন গোয়ালে তুললো। ওদিকে গোয়াল থেকে তাত মা সাড়া নিল বাছুরটা তাকালো এদিক ওদিক। ঘোষ বউ বললে, "নে ওঠ, ঢোক। যাই দেখে আসি ওদিকে গাই হামলে কি করে রোস্।"

কথাটা রটেছিল সর্বত্রই। রাণীর কানে ওঠেনি এটাই আশ্চর্য। তাই রাণী পাঁচিলের গায়ে আগল ঠেলে দাওয়ায় উঠে যখন দেখল কোথাও কেউ নেই, অন্ধকার, তখন ছেলের সুবুদ্ধিতে তার সামান্য অবাক লাগল বটে, কিন্তু যে পরিমাণ আহত তাকে দেখবে বলে আশা করে এসেছিল ঘোষ বউ, তার কিছুই দেখা গেলনা।

ঃ "ওমা, ঘোষ বউ যে পেচু পেচু এয়েচ?"

ঘোষেদের বড় বউ অপ্রস্তুত মুখে হাসল একটু ঃ "তাই বলি, দিদি এলো একা একা সাঁঝ নাগা ঘরখানা, তা পিদীম লণ্ঠন আখ কোতা গো দিদি? দিই জেলেজেলে?"

দাওয়ায় বসে জিরেন নিতে থাকে রাণী; "ব্যস্ত নেই কো কিছু বউ। আসুক আমার আজা, দোকানে তবে নিয়মমত যেতে নেগেচে!

বড় বউ বলতে গিয়েও বলেনা। তার উৎসাহ ঝিমিয়ে এসেছিল। কী দরকার এখনি কথাটা তুলে। যত আতই করুক, ঘরে তো ছেলে ফিরলেই, তখন মায়েতে পোয়েতে —

কাল বিহেনে আমাদের ঘরপানে তালে যেও গো দিদি। নতুন মোয়া রেখিচি গোটাকত। খানকত আমচুর। দোব দোব মন করি। আজাকে আজ ক'দিন দেখিনা, তা আমার দিদিই এসে গিয়েছে।। যেও অবিশ্যি দিদি।

ঘোষেদের বউ চলে যায়। আরও কতক্ষণ বসে থেকে রাণী পোঁটলা খুলে দেশলাই বের করে হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে। ফশ করে জেলে কোনাভাঙ্গা তক্তাপোশের তলা থেকে প্রদীপ বার করে জ্বালায়। লণ্ঠন সে এখন ঝাড়োরে। মোছোরে, কেউ কি তার কোথাও আছে? একটা মোটে ছেলে সেই কোলে বিধবা — সেই তক — তাও যদি ছেলে বুঝরান হত। বউ এনে দিত সেই রাখত জুগিয়ে জাগিয়ে। তা যার যেমন অদিষ্ট! হরি!!

"ওমা।" — চমকে ওঠে রাণী। "আঁধার ঘরে শুয়ে কেরে। আজু নৈকি?"

রাজা বলে, "মা, কখন এলে?"—তার গলা শুনে বোঝা যায় সে এতক্ষণ জেগে ছিল।

রাণী প্রদীপ নামিয়ে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে বলে, "অসুখ বিসুখ নয়তো আজু? লুকোসনি।"

রাজা উত্তর দেয়, "না মা।"

গেল ক' বারই দেখে গিয়েছিল রাণী। দু' ঘর চারঘর করে তারা আসতে লেগেছে। পাকিস্তানের নোক। নোক বেটে তারা এখেনেরই। এখন ভাগাভাগিতে এখেন আর সেখেনে তফাত। তারা তাই চলে আসতে লেগেচে। কেউ বা দোকান পাট করে, কারো বা জোত জমা, যে যা পারে, যে যা জানে। স্থানীয় লোকেরা এদের সন্দেহের সংগে দেখে। এরা যেন বড় বেশি বলিয়ে কইয়ে। বড় বেশি বুঝমান। সব যেন নিয়ে নেবে। দোকান পাট কলম কাছারি সর্বত্র এরা

ভিড় করে আছে। পূর্বদিকের লোক যাদু জানে। কী বলে কী করে বোঝা দায়। মেয়েমদ্দ সবাই সবখানে ঘুরছে বেরুচ্ছে কোনও আড় কিড় নেই। এর ভিতরেই কাছারী তশীলে এদের চাকরী বেশি, এদের মেয়ে বেশি পণ দিয়ে কিনতে সবাই তৈরী। এ নিয়ে পাড়ায় কথা কথান্তরও রাণীর কানে পেঁাচেছিল। এদের মেয়েরা কাঁথায় যে ফোঁড় তুলে দিয়েছে গাঙ্গুলীদের বাড়ি। সে দেখতে সেদিন ঘোষেরা দলে বলে বউয়ে ঝিয়ে গিয়েছিল। নারকোলের তক্তি যা বানাবে, অমৃত, তবে ডালে ঝোলে কী ঝাল, কী ঝাল।

দক্ষিণমুখো রাস্তাটা সোজা গিয়ে যেখানে চারদিকে চারমুখ খুলে দিয়েছে। সেই বাস-গাড়িগুলো জমা করার রাস্তার মোড়ে ওরা একটা দোকান দিয়েছে। সবাই তাকে হরি বাঙ্গালের দোকান, হরি বাঙ্গালের দোকান বলে বলে এসেছে এতদিন। দোকানটা ঠিক রাজার দোকানের পাশাপাশি বলে তার তত্ত্ব রাণীর কাছে পেঁাছত সবচেয়ে বেশি। দোকান বলে সে এক তিন-ঠেঙ্গে টিনের চালের ঘর। তার ভিতরে দেয়াল ঘেঁষে সরু একটি তার, তাতে হরিনাথের ময়লা ছেঁড়া শার্টটার সংগে টুকরো টুকরো রঙ্গীন ছিট ঝুলে থাকে। সেই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে হরিনাথ সারাদিন কাঁচি হাতে রঙ্গীন ছিট কাটাছাটা করে থাকে। মাঝে মাঝে সামনে ঝুঁকে রাস্তায় থুতু ফেলে। রাজার সংগে চোখাচোখি হয়ে গেলে হেসে বলে, "আপনের কাটতি কি র'ম?" ঘরের অবশিষ্ট মেঝের প্রায় সমস্তটা জুড়ে যে মান্ধাতার আমলের পুরোনো হাত কলটা আঢাকা পড়ে থাকে, তার দিকে হরিনাথের কিছু মাত্র লক্ষ্য আছে বলে মনে হয়না। রাজার মুদীর দোকান। হরিনাথের ব্যবসাটা ঠিক কি জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় কাটা কাপড়ের। কাপড় কাটা হয়—এ প্রত্যক্ষ। সেলাইয়ের জন্যে মজুত, এও প্রত্যক্ষ। কিন্তু তাতে সেলাই চলে কিনা। কে বা সেলাই করে, কী বা করে, এ সমস্ত জানবার জন্যে কারো উৎসাহ নেই এমন নয়। কিন্তু জানা যায়না।

সম্প্রতি সেখানে কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। এক তো হরিনাথ এক প্যাকেট দু' প্যাকেট করে বিড়ি দোকানের চালের তলে গুঁজে গোটা দু চার নতুন দেশলাই এ পকেট ও পকেটে ভরে দোকানে বসা সুরু করেছে। তার ওপর ইদানীং কলটাও আর অকেজো হয়ে পড়ে থাকছেনা। তার সামনে আজকাল দিনের অধিকাংশ সময় একটি অল্প বয়সী মেয়েকে বসে সেলাই করতে দেখা যায়। দেখতে অমন ঝর ঝরে পুরোনো হলে হবে, কী, কলটা চলেছে, সেলাই পড়ছে এবং হরিনাথের ঐ তেকাঠা দোকানের সামনে একে দুইয়ে ভিড়ও বাড়ছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে মেয়েটিকে রাজু প্রথমে লক্ষ্যই করেনি। এ হতে পারে যে নিজের ব্যবসায়ে ও মগ্ন ছিল। হরিনাথকে নিয়ে আর ও মাথা ঘামায়নি। যাতে হরিনাথের দোকানে কলের শব্দ উঠলেই ওর চোখ সেদিকে যায়। তা-ছাড়াও পাড়ার মুকুন্দকে ও যেমন বলেছিল, বউ যাওয়ার পর থেকে ওর চোখে কোনও মেয়েকেই আর জীবন্ত লাগেনা, সব যেন মরা প্রাণহীন, তার মত তেমনটি কি আর কোথাও কখনো দেখবে?

মুকুন্দ পাশের দোকানে চোখ ঠেরে বলেছিল, "চোখ মেলে দেখ দিকিনি, লয়ন সার্থক হবে।"

রাণীকে সে বললে, "বললে না পেত্যয় যাবে মাসী, ঐ একটি দিন দেখ্‌খে দিবার অপিক্ষে। আমি বলে বললুম মাসীরও দুঃখু, রেজোর না সংসারে মন লাগে। তা দেখি সেধো ভাত খাবি, না হাত ধুয়ে বসে আছি।"

রাণীর মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তবু একটু হেসে বললে, "মা-মাসীর সামনে ছড়া আউরোনি বাবা, নিন্দে।"

মুকুন্দর মা বললে, "নিন্দের কাজ করলে নোকে কি করবে? মুখে চাপা দিয়ে আথকে? বলে সেই "কিসের লাজ নাই দেখুন্তি নাজ"।

রাণী বললে, "নিন্দের কাজ নয়কো দিদি। আজু আমার মা—অন্ত পেরাণ। মা যে কালে তাকে মুখ ফুটে বলেচে বউ সে এনো দেবেই। পছন্দের ঠেকেচে। খোঁজ তালাস লিচ্ছে। ব্যাটাছেলে, নিন্দের কী?"

কিন্তু তার সারামুখ যেন লঙ্কাবাটায় জ্বলছিল। বাঙ্গালে ঘরের মেয়ে — কে জানে সে কী জানে তাদের সরম ভরম আচার ব্যাভার বাছ বিচেরের। সেই ঘরে সে যাবে আগ বাড়িয়ে কাজ করতে?

"তুই নাকি হরে বাঙ্গালের মেয়েকে বে করবি আজু?"

রাজা চমকালোনা। শান্তভাবেই বললো, "সে হবার লয়কো মা।"

রাণী থমকে গেল। কথা হচ্ছিল সে নেবে কিনা। এখন দেখা যাচ্ছে তারা দেবে কিনা এ প্রশ্নও আছে।

রাজাই কথা বললো ফের। "তারা ঢের ভদ্দরনোক, নেকাপড়া জানে।"

"তুইত তো জানিস। কেনে, তোকে আমি শিখাই নাই?"

"ওদের মন লয়। তুমি আবার এর তরে ভাবনা ধরনি। চারটি গরম ভাত আঁধো দিকিনি।"

ছেলেকে খেতে দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় ছেলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে রাণী।

"কাল এতে তো কই কিছু বললিনি হাঁরে?"

রাজা চুপ করে রইল।

"মেয়ে খুব সোন্দর পারা আজু? আমাদের বউমার চেয়েও?"

"খুব সোন্দর না।"

রাণী নিঃশ্বেস ফেলল। নিজেই ভুলেছে রাজু। তাকে হাতে ধরে মুখ ফিরিয়ে দিতে হয়নি। এমনিতেই চোখের দেখাতে ভুলেছে। ভাবতে ভাবতে ফিরে এলো রাণী শহরে কাজে। মাণিকতলা অঞ্চলে তার নতুন মনিববাড়ি শেয়ালদ ষ্টেশনে গিয়ে এই প্রথম সে চেয়ে দেখল ষ্টেশনের নতুন বাসিন্দাদের দিকে। আঁদারে পাঁদারে কাঁথা চাদর বিছিয়ে এরা সংসারের পাট পেতেছে। ছেলে কাঁদচে, মেয়েরা রান্নাবাড়ি করছে, সকাল গড়িয়ে দুপুরে পেঁাছে একসময়ে সন্ধ্যে করে আসচে। এদের যাবার ঘর নেই, ঘরে যাওয়ার চিন্তা নেই। ষ্টেশন প্লাট ফর্মের এক কোনা থেকে অন্য কোনা করেই এরা যেন দিন কাটাবে। এদের কি আর ঘরের বাঁধন আছে না টান আছে না শ্রীছাঁদ আছে। সে সব এরা ধুয়ে মুছে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে। এদের মেয়ে ঘরে এনে সে কি বংশ কুল নাশ করবে? এ কোনদিকে মন দিল তার রাজু? তার শিব রাত্তিরের সলতে? ছুটি পাওনা হবার আগেই বাড়ি যাওয়ার জন্যে এবার ছটফট করতে লাগল রাণী। রাজুর জন্যে সে রাজ রাজেশ্বরীর মত বউ এনে দেবে। অমন আটি মাটি চাটি বাপের মেয়ে সে যাচতে যাবে কোন সাধে?

বাস থেকে নেমে পড়ে হাঁটা পথ ধরবার আগেই এবার চোখে পড়ল তার মেয়েটিকে। সেলাই শেষ করে উঠে যাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। ছিপছিপে লম্বা মেয়ে। বয়সের তুলনায় মুখটা কিছু গম্ভীর। চুল ক'গাছাকে জড়িয়ে মাথায় স্তুপ করেছে। হাতে দু' গাছা প্লাষ্টিক চুড়ি। এ ছাড়া আর কোথাও সাজ সজ্জে পারিপাট্য কিছু বলতে কিচ্ছু নেই। পরণের শাড়িখানা ময়লা কি ময়লা। কিন্তু কী গড়ন্ত পিটোন্ত মেয়ে। মেয়ে বলতে এই। তারা বউ আনে সে সব ত খুকী।

রাণী একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে এগিয়ে এসে বললো, "তোমাদের ঘর কোথাকে?"

মেয়েটি তার দিকে তাকালো। তারপর হেসে বললো, "ঘর নাই।"

রাণী এর উত্তরে কথা খুঁজে পাওয়ার আগেই সে বললো, "দ্যাখবেন নি আমাগো বাসা? আসেন।"

দোকানের তেকাটায় পা দেবার জন্যে দুখানা থান ইঁট তেরছা করে পাতা রয়েছে। তাই বেয়ে মাথা হেঁট করে উঠে এল রাণী। দোকানঘর যেখানে বাইরে থেকে শেষ হয়ে গিয়েছে গিয়েছে মনে হয়, সেখান দিয়ে মই নেমে গেছে। কয়েক পা নামলে অন্ধকার একটা গর্ত বলে যেটাকে ঠাহর পেলে সেটাই হলো ঘর! কোনও এক কালে এটা পাকা ঘর ছিল। এখন এর পরিপক্কতার চিহ্ন খুঁজে বের করা কঠিন। যে সমস্ত ইঁট খসে গেছে তার ফাঁকে ফাঁকে কোথাও দু'টুকরো কাঠ কোথাও দু' দলা মাটি ঠেসে দেওয়া। ছাতটা দোকান ঘরের সংগে একই টিনের। এমন অদ্ভুতপূর্ব গৃহের পরিকল্পনা কে করেছিল বলা কঠিন। করেছিল বলে মেয়েটি সৃষ্টি কর্তার প্রতি প্রসন্ন এমন মনে হলো না।

"এহেনে থাকি আমরা। বসেন?"

মেঝেয় বাঁদিক দিয়ে কোনরকমে হাত দেরেক একটানা জায়গা বেরিয়েছে, সেখানে একটা বিছানা পাতা। তার শিয়র ধারে দুটো ঝকঝকে করে মাজা থালা বাটি। ডানদিকে বাকি যে সংকীর্ণ জায়গাটুকু তারই ভিতরে ছাই সমেত একটি তোলা উনুন পড়ে আছে।

রাণী বসলোনা। সসংকোচে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি শোও কোন্‌খেয়ে?"

মেয়েটি হেসে বিছানায় আঙুল দেখিয়ে বললো, "এই হানেই। বাবায়ও শোয়, আমিও ঘুমাই। যেদিনে খুব গরম করে, বাবার দোকানের বাইরে গিয়ে শুইয়া থাহে।"

মেয়েটির স্নান বেশভূষার বন্দোবস্ত নিয়ে রাণী আর কোনও প্রশ্নই তুলতে পারলনা। তার সাহসে কুলোলনা। সে নিঃশব্দে চলে এল। মেয়েটি কথা বলল, কিন্তু তাকে চিনতে পেরেছে কিনা বোঝা গেলনা।

বাড়ির পথ ধরল রাণী। কিন্তু ঘরে ফেরার আগেই থামলো ঘোষেদের দরজায়।

"ঘোষ বউ আছ নাকি?" এযাত্রা রাণীর আর জিরেনের দরকার নেই। জিরেন সে নিয়েছে। জিরেনই সাঁত্যা। ও ঘরে কেউ থাকতে পারে না জিরোতে পারে। তারই ভিতরে অমন বয়েসের মেয়ে। "সেবার সব অবোবস্থা রেখে চলে গিয়ে সে কী উপসর্গ বউ। খেতে শুতে শান্তি নাই। এবার এ কাজটি আমায় করে দিতে হবে। ঘোষকে পাঠাও বলে বুঝিয়ে, হরি বাঙ্গালের কাছে কথাটি তুলবে। আর দোমনা নাই। মেয়ের তো মা নাই। বাপের কাছে আমি যাওয়ার থিকে আছ তোমরা আপনার জন।"

নিজের ঘরে গিয়ে কয়োতলায় পা ধুতে ধুতে ফিরে ফিরে মেয়েটিকে মনে পড়তে লাগল। রাজা ফিরেছে অনেক ক্ষণ। মাকে দেখে বললে, "তুমি এর ভেতরে ছুটি পেলে?"

রাণী অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসল শুধু।

"আমি তো জানিনা তুমি আস বলে, এখুনি আত্তিরের খাওয়া খেলুম।"

"হোক। ..... মেয়ে দেখলুম আজু। দেকাসাক্ষেত হয় হাঁরে?"

রাজা আমল দিলনা কথাটাকে। বলল, "এবার বুঝতেছ মা, বিজিরি খুব বেশ কিছু জমলে দেখ এর পর একেবারে বড় শহরে গে জাঁকান দে বসব। চেরকাল জয়নগরে পড়ে থাকা কিছু নয়কো।"

"দূর দূর। কতকালের বাপপিতেমার ভিটে। এখানে জন্ম, এখেনে মিত্যু। আমি তো মেনে

নিয়েছি এবেরে সব ন্যাটা চুকিয়ে এসে বসব আপনার ঘরে। দুমুঠো খেতে একখান পরতে দিবিনে হাঁরে?"

অনেক কথা বললো তারা দুজনে মায়েতে ছেলেতে। যা বললোনা, সে কথাই যে তাদের মন জুড়ে আছে সবচেয়ে বেশি তা জেনেও তারা সে কথা এড়িয়ে রাখল।

দেবার থোবার কথা তুলতে বারবার করে বলে দিয়েছিল রাণী সে পণ দেবে। কত চাই। হরিনাথের টাকার দরকার। রাণীর দরকার মেয়েটিকে। ছোটবেলায় ছেলের পছন্দের খেলনা কেনার জন্যে সে মুঠো মুঠো রোজগারের —টাকা অক্লেশে খরচ করেছে নিজে না খেয়ে না পরে। আজো সে টাকা দিয়ে যা মেলে তার চেষ্টায় ত্রুটি করবেনা। মেয়ে ত ঘরে আসুক। একটা কেন, দশটা চাইলে অমন দশটা বউ কিনে এনে দেবে রাণী তার ছেলেকে। তার গতর বেঁচে থাক।

হরিনাথ প্রথমে রাজি হয়নি। তারা উঁচু ঘর, ভিন্ন বংশ। তবু রাজি হতে হল। ঘর, বংশ। ঘরের মেয়েকে খোলা দোকানে বসিয়ে কাপড় সেলাই করায় না সে? খেটে খাওয়া? এও খেটে খাওয়া। খেতে বরং পাবে এখানে। খেতে পরতে। থাকার ঠাই পাবে। হরিনাথের আছে কি? কিছুই নেই। তাই মেয়ে দিয়ে টাকা নেওয়ার কথা যে সে ভাবতে পারতনা, সেই টাকাও হিসেব করে গুণে নিল সে। রাণীর জিতের কোথাও খুঁত রইলনা। মাথা হেঁট করে আঁচলে আঁচল বেঁধে হরিনাথের মেয়ে তার ছেলের ঘর করতে এলো। সংগে এলো সেই বহু-দিনের পুরোনো কল। হরিনাথ বংশমর্যাদা একেবারে ভুলতে পারেনি। দানের নিয়ম রাখতে ওটিকে দান করেছে সে। বাপের কাছে বিদায় নিয়ে বিমলা শ্বশুর ঘর করতে এলো। হরিনাথ জয়নগরের দোকান তুলে দিয়ে চলে গেল; "তরে বেইচ্যা গেলাম মা। আর এহেনে পইড়্যা থাইক্যা কি করুম? তুই সুখী হস বিমলা। খিতভিত পাস "

"আমাগো খিতভিত নাই বাবা। আমাগো সাদআল্লাদ নাই।" বাপের কাঁধে মুখ গুজে বিমলা কাঁদতে লাগল।

রাণীর মনে হল এ ভালই হল। বাপের ঘরের টান না থাকলে বউয়ের মন পড়বে সহজে তার ঘরে। এ নিয়ে সে দু চার কথা পরামর্শ দিতে চেয়েছিল রাজাকে। কিন্তু তাকে আড়ালে পাবে কোথায়। সে কেবল আগলে বেড়াচ্ছে দেখ বউকে। যেন ফাঁক পেলে বউকে তার কে কি বলে কে কী করে। অথচ তার বউকে বলবে কে কী? ও বউয়ের সংগে বাক্যেতে পারা কি রাণীর কাজ। সেদিন ভালো বলতে গিয়েছিল; "বউ, অমন রাতদিন পুঁতে সেলাই করনি। মাজায় পিঠে খিল ধরবে। তোমাকেও এখন আর কাটা কাপড় কেউ বিক্রির করতে বলছেনি মাগো।"

বিমলা হেসেছিল। সে হাসি যতই মিষ্টি হোক, তার কথা যে ছুঁচলো পাথরের টুকরো; "রাতদিন তো করি নাই মা। আপনাগো কাম সাইরাই তো তয় বসি। আছে কাটাকাপড়গুলান। ফেলাইয়া রাখনের থিক্যা কিছু বানাই, পয়সা আসুক দুগ্গা। আমারে কিননের দামটা উইঠ্যা আসুক অন্ততঃ।"

মুক্তিপণ সংগ্রহ করছে সে। সে যেন এদের কেউ নয়। কিনে এনেছে বলেই এসেছে। এ ঘর দোর কিছুতেই তার মন নেই। তার মন কেবল ঐ পুরোনো যন্তরটায়। ও যেন তার আপনার জন। ছেলের বিয়ে দিয়ে ফেলে ভারি আপশোষ হতে থাকে রাণীর। কই, এমন যে বউ আনমনা, তাও তো কই ছেলে পরামর্শ নিতে আসেনা রাণীর কাছে? নেই বা বউর মন রইল ঘরে, তবু সেই বউ-ই তার সব। এমন করেই কি পুরুষ ছেলে ভেড়া হয়। মাঝে মাঝে

সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে রাণীর। ফের শহরেই যাবে। কি হবে তার এ সংসারে। কি আছে তার ঘরে। তবু ঘরের টান থাকে। মায়ায় বেঁধে রাখে।

বর্ষা কেটে দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। লক্ষীপূর্ণিমায় তারা বরাবর ব্রত উপবাস করে। বউকে নিয়ে ভারি ভয় ছিল রাণীর। আচার বিচের কী জানি কিসের জানে না জানে বউ। শেখাবার সুযোগ কোথায় তার। বউ কি তার না বউ তার ছেলের? বউ আপনার আপনি কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর দিন অমনিতেই বিমলা এসে বলল, "আপনাগো আলপনা আঁকা নাই?" তারপরে সে ব্যস্ত হলো পিটুলি গুলতে।

কী সুন্দর আলপনা আঁকলো বিমলা উঠোনে, দুয়োরে, ঘরের ভিতে। লতায় পাতায় চালেতে চিত্রে যেন তাদের গ্রাম এসে দাঁড়াল এ বাড়ির ভিটেয়। যে ছোট গর্তে থাকত বিমলা সে যে মিথ্যে, তার সত্যি বসতবাড়ির ছবি যে তার কাছে কত স্নিগ্ধ সুন্দর সত্য হয়ে আছে এ কথা যেন তার আলপনা কথা কয়ে লিখে গেল। পূর্ণিমার আলো তার রেখায় রেখায় জ্বলছিল। দাওয়ায় বসে রাণী কথা শুনতে লাগল।

যারা এসেছিল কথা শুনতে প্রসাদ নিয়ে চলে গেল। বউ যে ছিলনা বা একবারও এলনা এতে রাণী খুসী হয়নি। সারাদিন চিন্তির করে কী বা লাভ যদি মা লক্ষ্মীর প্রতি ভক্তিভাব না থাকে? ও সব রং ঢংয়ে দেবতা ভোলেন না।

কিন্তু মানুষ ভুলেছিল। খিড়কী দুয়োরে দাড়িয়ে কাঁদছিল বিমলা। তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল রাজা।

"তুই শিকলি কোতা এত সোন্দর আঁকা বউ?"

"ও-তো আমি বানাই নাই। আমি দেখ্‌ছি। আমাগো দ্যাশে চাঁদের আলোয় ঝোপে ঝাঁড়ে অমনি আলপনা পড়ত মাটিতে। কত ঘুরছি পথে পথে কোজাগরী রাত্র জাইগ্যা। হাগো, সে সব ভুইল্যা যাওনের আগে আমারে নি নিবা একদিন আমাগো দ্যাশে ফিরাইয়া!!"

শেষের কবিতায় প্রেম

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা নিয়ে এত আলোচনা হয়ে গেছে যে এবিষয়ে আবার আলোচনা করার হেতু নেহাৎ পুনরুক্তির ইচ্ছামাত্রে পরিগণিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তবু জগতের কিছু সংখ্যক সাহিত্য আছে যাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজনীয়তা চিরকালই থাকে—হীরক খণ্ডের মতই দৃষ্টিকোণভেদে এদের দ্যুতি বদলায়। শেষের কবিতার সাহিত্য-মূল্য সমালোচনার কষ্টিপাথরে বহুবার কষা হয়ে গেছে। সে সব কথা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে অবান্তর। শেষের কবিতা নিয়ে মতদ্বৈধেরও শেষ নেই। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে সবাই একমত হয়েছেন যে এটি প্রেমজ সাহিত্য। মানব হৃদয়ের এই বৃত্তিটির বিচিত্র বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাসই হোল শেষের কবিতা। সেখানে এই প্রেমের সমস্যা কীরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এর সমাধানেই বা কী সমাজসত্য ও হৃদয়সত্য প্রতিফলিত হচ্ছে তাই আমার আলোচনার বিষয়।

লাবণ্য অমিতের পূর্বরাগের কাহিনী কবিত্ব ও মাধুর্যে অনুপম হলেও শেষের কবিতার সমস্যা তা নয়। লাবণ্য অমিতের বিচ্ছেদ, মতিশংকরের কাছে অমিতের দেওয়া সেই ঘড়ার জল আর দীঘির উপমা এবং সর্বশেষে লাবণ্য ও শোভন লালের মিলন, এগুলিই হোল শেষের কবিতার সমস্যা। কিছুদিন আগে জনৈক বন্ধুর সংগে এ বিষয় আলোচনা করেছিলাম। বন্ধুটির মতে লাবণ্য অমিতের বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে এই সমাজসত্যই প্রকাশ পেয়েছে যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর মধ্যে প্রেম সম্ভব হয়, কিন্তু মিলন সুখকর হয় না। রবীন্দ্রনাথের সে বোধ ছিল তাই মিলনের পূর্বমুহূর্তে তিনি লাবণ্যকে সরিয়ে আনলেন।

লাবণ্য অমিতের প্রেমোপাখ্যানের প্রথম হতে যে বেসুরটি বাজে তাহচ্ছে অমিতের সম্বন্ধে লাবণ্যের আশংকা। লাবণ্য জানে যে অমিতের 'বন্যা' অনেকখানিই কল্পনার সৃষ্টি। প্রাত্যহিক লাবণ্যের স্পর্শ তাকে ম্লান করবে, প্রেম যাবে রসাতলে। তাই প্রথম হতেই লাবণ্যের বিবাহ বন্ধনে আপত্তি ছিল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ওদের বিচ্ছেদটা অমিতের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লাবণ্যের আশংকার ফল না ধনীদরিদ্রের মধ্যে সেই চিরন্তন বৈষম্য উপলব্ধির ফল?

আমার বন্ধুটির পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি হোল যে অমিতের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে লাবণ্যের আপত্তিটা প্রাথমিক। সে আপত্তি খণ্ডিত হয়েছিল এবং লাবণ্য ধরাও দিয়েছিল। কিন্তু কেটি-সিসির আগমনে লাবণ্য বুঝতে পারলো যে তার নিজের সমাজ ও অমিতের সমাজে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সে বুঝতে পারলো যে অমিতের সমাজে মিশে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবেনা—ফলে অমিতের প্রাত্যহিক জীবন হবে বিড়ম্বিত। এই উপলব্ধির ফলেই লাবণ্য নিজেকে সরিয়ে আনলে।

উপরোক্ত অভিমত একদিক দিয়ে সত্যি সন্দেহ নেই। কিন্তু সব দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় লাবণ্য অমিতের বিচ্ছেদে সমাজের স্তরভেদ যতটা দায়ী অমিতের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও ততখানি দায়ী। বস্তুতঃ এ আশংকা তো লাবণ্যের মনে প্রথম হতেই ছিল। শুধু

এক বর্ষণমুখর দিবসে সকল কিছু আশংকাকে ছাপিয়ে প্রেম তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করেছিল মাত্র। কিন্তু অমিতের চরিত্র বৈশিষ্ট্য, তার কল্পনা বিলাসিতা, অসাধারণ ও সুদূরের প্রতি তার মোহ তিরোহিত হয়নি। শেষের কবিতার ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ আছে। এমনকী অমিত যখন দাম্পত্য জীবনের কথা কল্পনা করছে তখনও তার আশংকা পাছে মিলনটা প্রাত্যহিক হয়ে দাঁড়ায়। তাই নানা নিয়ম অবলম্বন করে দূরত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা। অমিতের সম্বন্ধে লাবণ্যের এই যে আশংকা এ ভেতরে ভেতরে লাবণ্যের সম্মতির ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। অথবা বলা যায় যে লাবণ্যের সম্মতির ভিত্ কোন কালেই পাকা হয়নি। তাই কেটি সিসির আক্রমণে এতো সহজেই মিলনের সৌধ মহল ভেঙ্গে পড়লো। শেষের কবিতা বার বার পড়ে আমার এই মনে হয়েছে যে লাবণ্য অমিতের বিচ্ছেদ শুধু একটি সমাজ সত্যকে প্রকাশ করছে না, প্রকাশ করছে হৃদয় সত্যকেও।

এরপর আসা যাক যতিশংকরের কাছে অমিতের ঘড়ার জল আর দীঘির উপমার কথায়। হয়তো রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রেমের দুটি রূপের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কথাগুলি অমিতের মুখে অনেকটা সান্ত্বনা বাণীর মতো শোনায় — সে সান্ত্বনা অবশ্য তার নিজেকেই দেওয়া। ঘড়ার জলে আর দীঘির জলে প্রভেদ আছে নিশ্চয়ই,— কিন্তু লোকে দীঘি হতেই ঘড়ার জল বয়ে নিয়ে আসে এবং তাতে দীঘির দীঘিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। বস্তুতঃ সে ভালোবাসা সতিই গভীর ও সর্বব্যাপী তাতে আকাশের মুক্তি আর গৃহকোণের শান্তি দুই-ই পাওয়া যায়। জীবনের প্রয়োজন ও রোমান্স সেখানে পরস্পর বিরোধী হয় না। দৈনন্দিন প্রয়োজন ও রোমান্স প্রেমের বিভিন্ন দিক মাত্র। অনেকে প্রেমের এই দুটি দিককে বিভিন্ন পাত্রে রূপায়িত হতে দেখেন বটে, কিন্তু ওটা প্রেমকে খণ্ডিত করে দেখারই মতো। উপরন্তু অমিতের ক্ষেত্রে পাত্র ভেদটা প্রথমেই হয়নি — অবশ্যার চাপে পড়ে সে এই পাত্র ভেদ মেনে নিয়েছে। তাই এই উক্তি ওর অক্ষমতারই পরিচয় দেয় মাত্র — দীঘি হতে ঘড়ার জল বয়ে নিয়ে আসার অক্ষমতা। অবশ্য এই অক্ষমতার জন্য ওর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনেকখানি দায়ী। বস্তুতঃ অমিত চরিত্রে কাব্য, উচ্ছ্বাস আর খেয়ালীপণা যতটা আছে মেরুদণ্ড সে পরিমাণে নেই। রবীন্দ্রনাথ ঐ চরিত্রে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কী না কে জানে।

এরপর আসে লাবণ্য শোভনলালের কথা। এদের মিলনটা যতোটা আকস্মিক মনে হয় ততোটা কিন্তু নয়। লাবণ্য পূরাবৃত্তে কবি নিজেই বলেছেন যে লাবণ্যরমন নিজের অজ্ঞাতেই শোভনলালকে বর দান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল, কিন্তু নীরব শোভনলাল তেমন করে ডাক দেয় নি। তাই যেটা হতে পারতো ভালোবাসা সেটা হয়ে দাঁড়ালো অন্ধ বিশ্বেষ। কিন্তু কালের ব্যবধানে লাবণ্যের দৃষ্টি হতে বিশ্বেষের কুহেলিকা সরে যাবে এতো স্বাভাবিক। তবে এক্ষেত্রে অমিতের সংগে বিচ্ছেদের ফলেই লাবণ্যর মন শোভনলালের কথা ভাবতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই। হয় তো অমিতকে ভালোবাসার ফলেই শোভনলালের প্রেমের স্বরূপ চেনা লাবণ্যর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এ পর্যন্ত লাবণ্য-শোভনলালের মিলন প্রেমের ইতিহাসে কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনা। কিন্তু বইটির শেষে অমিতকে লেখা লাবণ্যর কবিতা সতিই একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। লাবণ্য সেখানে অমিতকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— "সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়, সে আমার প্রেম। তা'রে আমি রাখিয়া এলেম অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।" আবার শোভনলাল প্রসংগে বলেছে—"উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে সেই ধন্য করিবে আমাকে।" তবে কী লাবণ্য শোভনলালের মিলন সুধুই লাবণ্যর আত্ম-ত্যাগ? হয়তো নয়। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ প্রেমের যে দ্বৈত রূপ দেখাতে চেয়েছেন তা

লাবণ্যের জীবনেই ফুটেছে ভালো। প্রেমকে রোমান্সের প্রেম আর প্রয়োজনের প্রেমে খিবখণ্ডিত করলে প্রেমের স্বরূপ চেনা যায় না বটে কিন্তু তবু প্রেমের প্রকৃতিভেদ আছে। লাবণ্যর জীবনে অমিতের প্রেম যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি। হঠাৎ এসে ওর সকল অনুভূতিকে, ওর জীবনকে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে প্রেমের দীপ্তি বিদ্যুৎ সম হলেও তা ক্ষণিক। আর সেই ক্ষণিক মুহূর্ত শেষে জীবনে যে অন্ধকার নেমে আসে তা দূর করতে পারে একমাত্র শোভনলালের প্রেমের নিকম্প শিখা। অমিতের প্রেম যেন ঝোড়ো হাওয়া; এ শুধু উড়িয়ে নিয়ে যায়, আশ্রয় দেয় না। আর শোভনলালের প্রেম হচ্ছে নির্ভরতায় ভরা, খুঁটি বিচ্যুতি সব কিছু উপেক্ষা করে এ জীবনের মর্মে মর্মে অনুপ্রবেশ করে, দুঃখের দিনে এ প্রেম গাঢ়তর হয়। লাবণ্য হয়তো অমিতের প্রেমের স্বরূপ বুঝেছিল তাই তাকে চিরন্তন করে রাখতে চায় নি—অমিতের স্বপ্ন-রাজ্যে তার বাস নির্ধারিত করেছে। আর নিজেকে তুলে ধরেছে — শোভনলালের কাছে, যার প্রেম আপন স্বরূপেই চিরন্তন। প্রেমকে ধরে রাখার জন্য যার প্রয়াস করতে হয় না — কাব্যও সে প্রেমের পাশে নিরর্থক। সেই সর্বব্যাপী প্রেমের কাছেই লাবণ্যর আত্ম নিবেদন। বস্তুতঃ অমিত ও শোভনলালের প্রেমের স্বরূপের বিভিন্নতাটুকু বুঝতে পারলে শোভনলাল ও লাবণ্যের মিলনকে লাবণ্যের আত্মদান বলে ভুল হবেনা, আত্মনিবেদন বলেই চেনা যাবে।

মীরা দত্ত

সংস্কৃতি প্রসংগে

বর্ত্তমানে যে দুটি কথা সবচেয়ে বেশী শোনা যায়, তা হল দুর্নীতি ও সংস্কৃতি। এর মধ্যে দুর্নীতিতে প্রভূত অসঙ্গতি মনে হলেও, এই দুটি বিপরীত ধর্মী বিষয় সমাজে ভারসাম্য রক্ষা করছে এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না, বিপরীত ধর্মী হলেও, মাঝে মাঝে এদের মধ্যে যে গোপন আঁতাত সৃষ্টি হয়, তা সব সময় গোপন থাকে না, তবে আমার মুখ্য বক্তব্য তা নয়। সংস্কৃতির যে জোয়ার বর্ত্তমানে বইছে তাতে হঠাৎ মনে হয় বাঙালী বুঝি আর একটা নব-জাগরণের যুগের ভিতর দিয়ে চলেছে। সর্বত্র সংস্কৃতি সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লেগেই আছে। সমাজে যাঁরা বুদ্ধিপন্থী ও চিন্তাশীলদের মধ্যে অগ্রণী উৎসাহ ও জ্ঞান দান করেছেন। গুপ্তকবি যখন ভণ্ড বঙ্গদেশে রঙ্গের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করেছিলেন, সে যুগ থেকে আজ 'ভণ্ড' বেড়েছে কিনা হলফ্ করে বলা না গেলেও, বাঙালী জাতি যে বঙ্গ ভণ্ডজীবনের বিপর্যয়ে চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত তা স্বতস্বীকৃত। অপর দিকে, সংস্কৃতিকে রঙ্গ বলে পরিহাস করবো এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। তবু সংস্কৃতি বলতে যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাচ গান অভি-নয়ের আসরকেই বোঝানো হয়, তখন গুপ্ত কবির 'রঙ্গ' থেকে তার পার্থক্য বিশেষ পাওয়া যায় না। গুপ্ত কবির উক্তি আক্ষেপব্যঞ্জক বা সবিস্ময় প্রশংসাব্যঞ্জক তা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। বাঙালীর জাতীয় জীবনে আজ যে প্রবলতম আলোড়ন চলেছে তার মধ্যে সংস্কৃতির স্থান প্রশংসাসূচক হলেও বিসদৃশ ঠেকে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সংস্কৃতি কি, এ নিয়েই মতভেদ আছে। আসলে ইংরেজী কালচার (Culture) শব্দটির

বাঙলা প্রতিশব্দ হাতড়ে আমরা সংস্কৃতি শব্দটা তৈরী করেছি। প্রাচীনেরা বলতেন কৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দটির প্রয়োগকে ব্যঙ্গ করেছেন 'তাসের দেশ'এ এবং তিনি নিজেই সংস্কৃতি শব্দটির প্রচলন করেছেন। ইদানীং শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এই দুটি শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে কৃষ্টি শব্দটিকেই অধিকতর অনুমোদনযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা চলতে পারে, তবে কৃষ্টিই হোক আর সংস্কৃতিই হোক যা আমরা বোঝাতে চাই তা ইংরেজী কালচার শব্দের বক্তব্য বিষয়।

অন্নদাশঙ্কর কালচার শব্দটি কৃষিমূলক বিধায় সংস্কৃতিকে ঐতিহাসিকভাবে কৃষিযুগের সৃষ্টি বলে ইঙ্গিত করেছেন। আরও বলেছেন, মনের কর্ষণেই কালচার। তাঁর মতে সংস্কৃতিকে একাধারে মডার্ণ ও মরাল হতে হবে। সত্য ও অহিংসার সঙ্গে সৌন্দর্য্যকে যোগ করে তিনি সংস্কৃতিকে পূর্ণাঙ্গ করার প্রস্তাব করেছেন।

কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান মতে কালচার কোন অবাস্তব বস্তু নয়। একটা মানবগোষ্ঠী বংশপরম্পরায় লব্ধ জীবনযাত্রার পরিবেশকে যুগের প্রয়োজনে খাপ খাইয়ে ক্রমশঃ রূপান্তরিত করে চলে। জীবনযাত্রার এই বংশগত অথচ যুগোপযোগী সামগ্রিক পরিবেশই সমাজবিজ্ঞানের মতে কালচার বলে অভিহিত। এই দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে নৌকো, হাল ঘরের চাল, কাঁথা, নারকেলের খাবার, ইতুপুজো, কথকতা সত্যপীরের গান — সবকিছুই কালচার বা সংস্কৃতির অঙ্গ।

চলতি কথায় কিন্তু আমরা কালচার বলতে বুঝি মার্জিত মন, মার্জিত রুচি ও মার্জিত ব্যবহার। সেই মনোমার্জনের পিছনে কিছু পড়াশোনাও থাকা দরকার। এই সবকিছু যাঁর চরিত্রে আছে তাঁকেই বলি আমরা কালচার্ড। কালচার্ড কথাটির একটি উন্নাসিক অর্থও এযুগে বেশ পরিস্ফুট। সেটা ফ্যাসানেবল শিল্পপ্রিয়তা। যেমন ধরুন যামিনী রায়ের একখানা ছবি, আলপনা আঁকা মাটির ঘট পেতলের ঘড়া, পোটোর আঁকা দেবীমূর্ত্তিযুক্ত সরা আর বাঁকুড়ার পোড়ামাটীর ঘোড়া — এই দিয়ে ঘর সাজানোই আজ একশ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলে গণ্য।

প্রচলিত জনতা অর্থে কিন্তু কালচার বা সংস্কৃতি বলতে আজ এদেশে নাচ গান বাজনাকেই বোঝায়, বিশেষ করে তার মধ্যে যদি পল্লীগীতি, পল্লীনৃত্য ও পল্লীবাদ্য থাকে তবে তো কথাই নেই। এ ধরণের মঞ্চস্থ বা অঙ্গনস্থ বা প্রাঙ্গণস্থ অনুষ্ঠানকে বলা হয় কালচারাল শো বা সাংস্কৃতিক আসর।

সবকিছু মিলিয়ে কালচার বা সংস্কৃতি বলতে আমি যা বুঝেছি তা হল, জীবনকে সুন্দর করার উপাদান। এর সঙ্গে টীকা যোগ করা প্রয়োজন। জীবন অর্থে গোষ্ঠীগত বা সমষ্টিগত সামগ্রিক জীবন। উপাদান অর্থে বাস্তব এবং অবাস্তব উভয়বিধ উপাদান। অধিকন্তু উপাদানগুলি ঐতিহ্যগত, কিন্তু বর্ত্তমান জীবনকে সুন্দর করার প্রয়োজনে তা বাস্তবনিষ্ঠ হওয়া অপরিহার্য্য। অবাস্তব উপাদান বলতে শিক্ষা, জীবনাদর্শ, জীবনাদর্শন, রুচি, ব্যবহার, মনোভাব প্রভৃতি অনেককিছুই বুঝতে হবে। আর বাস্তব উপাদান হল সম্পদ উৎপাদনের হাতিয়ার, যানবাহন, আবাস, শিক্ষাব্যবস্থা, মনোরঞ্জন ব্যবস্থা প্রভৃতি। এককথায় জীবনযাত্রায় যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই সংস্কৃতির আওতায় পড়ে। অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি জীবনের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির কাজেও বিশেষভাবে ব্যবহৃত হবে। আর একমাত্র 'রুচির উপর নির্ভর করে মানুষ বাঁচতে পারে না' বলেই গানবাজনা, স্থাপত্যভাস্কর্য্য — খেলাধূলা, পাটঅধ্যয়ন ইত্যাদি প্রয়োজন, শুধু জীবনের সৌন্দর্য্যবিধানেই নয়, জীবনধারণের প্রয়োজনে। এ প্রসঙ্গে 'ধর্ম্ম' সংস্কৃতির অঙ্গ, ধর্মীয় গোঁড়ামী নয়, কারণ ধর্ম্ম জীবনকে ধারন করে আর দেবতা যে মানে না

সেও ধার্মিক হতে পারে, যদি তার জীবনদর্শন থাকে।

সংস্কৃতির এই সংজ্ঞাকে স্বীকার করে নিলে আজকের সংস্কৃতির প্লাবন হঠাৎ একটু বিসদৃশই মনে হবে। কারণ নিছক টিকে থাকার চেষ্টাতেই যেখানে সমস্তশক্তি ব্যয় হচ্ছে সেখানে জীবনের সৌন্দর্য্যবিধান করবার অবকাশ কোথায়? প্রাণ রাখতেই যে প্রাণান্ত! তবে যারা সংস্কৃতি কর্মী অর্থাৎ শিক্ষিত বা শিক্ষাভিমানগ্রস্ত মধ্যবিত্তসমাজ তারা আজ যে প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত বোধ করছে, তা ন্যূনতম প্রাণ নয়, মিনিমামের সাধনা নয়। সুন্দরতর ও সম্পূর্ণতম জীবনই আজ তাদের দাবী, তাই সংস্কৃতিও মৌলিক দাবীর মধ্যে এসে পড়ে। আর ন্যূনতম প্রাণটুকু বজায় রাখতেই যাদের আজ সত্যি প্রাণান্ত ঘটছে, সেই পল্লীগ্রামবাসী চাষী-জোলা-জেলে প্রভৃতি, তাদের জীবনে সংস্কৃতির নতুন প্লাবন তো দূরের কথা, প্রাচীন ক্ষীণধারাটুকুও দিনে দিনে শুকিয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথ বহুবছর আগে এ সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা সত্ত্বেও কেউ অবহিত হন নি।

অবহিত হননি বললে হয়তো এখনি কলকাতার সংস্কৃতিকর্মীরা কলরোলে প্রতিবাদ করবেন; কি মশায়? আজ লোকশিল্প পল্লীগীতিবাদ্যের কদর শিক্ষিত সমাজে কি পরিমাণ বাড়ছে তার খবর রাখেন এবং তা পরিবেশনের জন্য কি অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলছে জানেন?

এই প্রসঙ্গেই আমার আসল বক্তব্য উপস্থাপিত করা সহজ হবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোরঞ্জন করাই পল্লীসংস্কৃতির পরমার্থ কিনা? যে জীবনযাত্রাকে ঘিরে, যে জীবনযাত্রার সৌন্দর্য্যবিধানে পল্লীসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তা-ই আজ আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন সেখানে "ভাঙ্গা ঘর ও ফাঁকা ভিটেতে জমেছে সর্বনাশের কালো।"

এ অবস্থায় বাঁকুড়ার পোড়ামাটীর ঘোড়া আমেরিকায় চালান হলে (সহরে দোকানদার ও রপ্তানী লাইসেন্সওয়ালাদের পকেটে পুরোলাভের অঙ্কটি তুলে দিয়ে), ক্যামকস্ত্রীটের বাড়ীর সিঁড়িতে লক্ষ্মীসরা শোভা পেলে, বছরে একদিন মার্কাস স্কোয়ারে বা ইন্টালীর মাঠে ক্ষীরোদ নট্টের ঢোল বা শেখ গুমানির তরজা পরিবেশিত হলে, নবনীদাসতনয় পূর্ণদাস মাঝে মাঝে গেরুয়া সাজ পরে বিশিষ্ট বিদগ্ধ আসরে বা রেডিওতে বাউল গাইলে কিংবা নির্মল চৌধুরী ভাটিয়ালী গেয়ে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলে — বাঙলার পল্লীসংস্কৃতির প্রকৃত সুরাহা হবে কি?

ময়রা স্ট্রীটের এয়ারকণ্ডিশান করা 'ঘরে' বসে যখন কেউ বলেন সাউথ সী'র কিংবা সাঁওতালদের জীবন কি সুন্দর! তাদের আমেরিকান ফিল্ম দেখা কিংবা রোমান্টিক কবিতা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার জোরে ওই উদ্ভি রসিকতা কিংবা অবজ্ঞা তা বোঝা শক্ত।

বর্ত্তমানে সহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত — তা তিনি ছিদাম মুদী লেনেই থাকুন বা ডোভার লেনেই থাকুন, চব্বিশ চৌরঙ্গীতেই থাকুন বা বাঁশধানী রোডেই থাকুন — সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পল্লীসংস্কৃতির পিঠ চাপড়ান।

একথা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে ভারতের বহু সহস্র বছরের স্থাণু জীবনযাত্রায় আজ প্রবল আলোড়ন এসেছে, আর চাই না বললেই তা এড়ানোর উপায় নেই। কৃষিনির্ভর জীবন থেকে আমরা একলাফে পরমাণুশক্তি নির্ভর জীবনে উত্তরণ করছি। ইংরেজ যা করেছে চার-পাঁচশ বছরে বাণিজ্য নির্ভর জীবনের খেয়া বেয়ে, আমেরিকায় যার বিবর্তন ইংরেজের প্রচেষ্টার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায়ই এগিয়েছে বলা যায়, আর বিরাট বিপ্লব সত্ত্বেও রাশিয়া যা সম্পন্ন করতে অন্যূন পঁচিশ বছর নিয়েছে, আমরা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে তা করতে চাইছি দুটিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। সে ধাক্কা আমাদের ওলট পালট করে দিচ্ছে, কি মনের

দিক দিয়ে, কি জীবনের বাস্তব পরিবেশের দিক দিয়ে — এই সহজ সত্যটুকু সম্বন্ধে আমাদের সংস্কৃতি কর্মীদের অবহিত হওয়া দরকার।

পল্লীসংস্কৃতি মনোরঞ্জক হিসেবে কেমন বস্তু সে প্রশ্ন অবান্তর। প্রশ্ন হল, প্রচলিত পল্লীসংস্কৃতির সঙ্গে নতুন ও পরিবর্তনশীল পল্লীজীবনের সম্পর্ক কতটুকু! বাঙলার খিন্ন-খণ্ডিত হওয়া এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষিনির্ভর সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। পশ্চিম বাঙলার বাঁচার প্রয়োজনেই আজ কৃষিকে মুখ্য জীবিকার আসন থেকে সরে গিয়ে অন্যতম জীবিকার ঠাঁই নিতে হয়েছে। তার জায়গায় আসছে ,জলবিদ্যুৎচালিত কুটীরশিল্প অথবা বিরাট যন্ত্রশিল্প। গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হচ্ছে নতুন নতুন ক্ষুদে সহর বা টাউনশিপ। দেবায়তনে পূজা মানতের স্থান নিচ্ছে ভ্রাম্যমান বা স্থায়ী চিকিৎসালয়, যাত্রা-কথকতা-পালা-কীর্তন কবিগান জাতীয় মনোরঞ্জন কুটীরশিল্পকে বিতাড়িত করছে সিনেমা নামক মনোরঞ্জন যন্ত্রশিল্প, আউল বাউলের দেহতত্ত্বগীতিকে কেউ আর আজ সম্মানজনক জীবিকা গণ্য করে না, ঢাকীঢুলি হঠে যাচ্ছে মাইকে বাজানো রেকর্ডের কলরোলে।

আশ্চর্য, আমাদের শিল্পকর্মে তার কোন স্পর্শ নেই। ষষ্ঠীর প্রাদুর্ভাব কেটে গেলে তার ঘোড়ার পক্ষে বৈঠকখানায় বাহার করে থাকা অর্থহীন। চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যে বা নাচেও অভিনয়ে কোথায় প্রগতিশীল ও গঠনশীল জীবনানুভূতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার প্রচেষ্টা শিল্পের মধ্যে যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, প্রকাশ পেয়েছিল দৈন্য ও দুর্ভিক্ষ শিল্পে ও সাহিত্যে, আজ যে আমরা তার স্তর পেরিয়ে এসেছি শিল্পকর্মীরা তা অনুভব করেন এমন প্রমাণ তাঁদের সৃষ্টিতে নেই। বাঙলার কথাসাহিত্যে আজ শুধু বাস্তবের চিত্রায়ণ, তাতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন ঠাঁই পায় না, কবিতা এখনো নারকেল পাতায় জ্যোছনার ঝিলিকের বন্দনা অথবা বন্য জীবনের কুৎসা। পরিপূর্ণ নবজীবন — যে জীবন আসছে, অনিবার্যভাবেই আসছে, ছুটে আসবে কি হেঁটে আসবে তাই শুধু আমাদের প্রচেষ্টা নির্ভর — সেই জীবনের বলিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে প্রেরণা যদি শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা না দেয় তো কে দেবে?

যে জীবনসৌধ ভেঙে পড়ছে তার জন্য কাঁদুনি গাওয়া যেমন নিরর্থক তার খসে পড়া চাপড়াকে আমাদের জীবনের অলংকরণ বলে ঘোষণা করাও তেমনি নিরর্থক এবং ক্ষতিকরও বটে। তাকে বড় জোর মিউজিয়ামে অতীতের সাক্ষ্য হিসেবে সাজিয়ে রাখা চলে।

চলমান জীবনের সঙ্গে যা চলে না তা আর যাই হোক, সংস্কৃতি নয়, কারণ সংস্কৃতি ও জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অথচ সংস্কৃতি ঐতিহ্যনির্ভরও বটে। তাই আজ সংস্কৃতি কর্মীর কাজ হবে যতখানি পরিবর্তন করলে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল নবজীবনের অঙ্গীভূত হতে পারবে, সেইভাবে পরিবর্তন ও প্রবর্তন করা। জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতি বদলাবে, কিন্তু জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহ্যগত, তাকে হঠাৎ বদলানো যায় না। সংস্কৃতিও ঐতিহ্য-বিবর্জিত হলে তা আর সংস্কৃতি থাকে না, 'বোম্বাই খেল্' হয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন ঐতিহ্য বিবর্জিত ইংরেজী শিক্ষা, প্রাচীন শিক্ষাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে প্রাচীন শিক্ষার সমন্বয় — এই তিনটি প্রক্রিয়ার তিনরকম ফল আমরা দেখেছি এবং বলা বাহুল্য প্রথম দুই শ্রেণী নিঃশব্দে লোপ পেয়েছে, তাদের জন্যে একফোঁটা চোখের জল কেউ ফেলেনি।

আজ সংস্কৃতি কর্মীদের সামনেও এই একই কর্মপন্থা। অতীতকে সত্য ও একমাত্র সংস্কৃতি বলে আঁকড়ে থাকার ফলে, নতুন অবস্থার চাপে প্রয়োজন মেটাবার জন্য ফাঁক পেয়ে

ঢুকে পড়ছে "লারে লাপ্পা" সংস্কৃতি। জাতির একটা সন্ধিক্ষণে আমরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্রকে পেয়েছিলাম আর তার পরিণতি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথে। আজ অপর এক এবং অনেক বৃহত্তর সন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়েছি। রামমোহন প্রমুখের মত বিরাট পুরুষের যুগ যদি গত হয়েই থাকে, তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হাজার হাজার ক্ষুদে রামমোহন আজ চাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে, আর সর্বক্ষেত্রের সমষ্টি নিয়েই কালচার, তাকে কৃষ্টিই বলি আর সংস্কৃতিই বলি, বাস্তববোধ বর্জিত পরিবর্তনকে অস্বীকার করা সংস্কৃতি যতই সম্মেলন বসাক, তাতে সার্কাসের মতো শিশু মনোরঞ্জনের সাময়িক তুচ্ছ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

বরং অন্নদাশঙ্কর যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাই ঘটবে, ভোলানোর কাজে সংস্কৃতিকে লাগালে সংস্কৃতির মর্যাদা লুটোবে ধুলায়। মনে হচ্ছে বর্তমানের পরিবেশ এই ধরণের বলেই বোধ হয় আজ কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতি সংস্কৃতির সঙ্গে দোস্তি পাতাবার চেষ্টা করছে, অন্য হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির মুখোস হচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী।

রাখাল ভট্টাচার্য

স মা জ স ম স্যা

পরাভূত রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র তিরোভাবের পরবর্তী কয়েক বছরের শোকাভিভূত অবস্থা বিগত; যুদ্ধোত্তর বারোয়ারী রবীন্দ্র-উৎসবের চাকচিক্যও এখন আর নতুন নেই। বোধহয় ঠিক আজকের দিনেই আমাদের সমাজ মানসে রবীন্দ্রপ্রভাব পরিমাপের সৎ প্রয়াস সম্ভবপর।

একথা শুনতে হয়ত আশ্চর্য্য লাগবে — কিন্তু তবু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও আজ তাঁর তিরোভাবের মাত্র সতের বছরের মধ্যেই, — তাঁর সত্যিকারের প্রভাব বাংলার সমাজ জীবনে কিম্বা মানসিকতায় সামান্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। সমাজের যে গরিষ্ঠ শ্রেণী আমাদের গ্রামে, সহরে, নগরে, বন্দরে কায়িক শ্রমের বিনিময়ে অন্ন-সংস্থান করে থাকে, তাদের কথা এখানে বেশি আলোচনা করব না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করে গেছেন যে বিচিত্র পথে গেলেও, তাঁর বাণীর প্রভাব জীবনের সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছুতে পারে নি। তিনি নিজে এজন্য আক্ষেপও ভোগ করেছেন; কিন্তু আমরা জানি এর পুরো দায় তাঁর ছিল না। ব্রিটিশ আমলের সুরু থেকেই, কিছুটা আমাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার দোষে, কিছু বা অভিজাত আমলা-সামন্ত শ্রেণীর আমদানী করা বিকৃত বিদেশী মূল্যবোধের প্রভাবে এবং কিছু পরিমাণে আবার লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতির দেশজ মাধ্যমগুলির শোচনীয় অবক্ষয়ের জন্য আমাদের সমাজের ওপরতলার শিক্ষিত শ্রেণী এবং শ্রমজীবি সাধারণ জনতার মধ্যে পার্থক্যের নিরন্ধ্র পাঁচিল এমন মজবুৎ হয়ে গড়ে ওঠে, যাতে এপারের কোন আলো কোন সুরই ওপারের হতাশ্বাস অন্ধকার জীবনে গিয়ে পৌঁছুতে পারে নি। যদি কিছু পেঁছে থাকে তা মত্ততার চিৎকার। রবীন্দ্রনাথ শুধু পুরোন বর্ণভেদের নয়, নতুন যুগের নতুন আবর্জনা — এই নবসৃষ্ট বর্ণভেদেরও বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এযুগের সিমেন্ট কংক্রিটে গাঁথা দেয়াল টলাবার সাধ্য তাঁরও ছিল না। অথচ এর ফলভোগ তাঁকে করতে হয়েছে। প্রাচীন যুগের উপনিষদে, রামায়ন, মহাভারত, লোকায়ত দর্শন, বুদ্ধ বাণী থেকে সুরু করে মধ্য-যুগের জয়দেব, বিদ্যাপতি, তুলসীদাস, চন্ডীদাস, কবীর, নানক বা সুফিসাধকগণ পর্যন্ত— সব কবি, সাধক, মনীষীর বাণীই শ্রেণী নির্বিশেষে কোন না কোন ভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজসভা, নগরে বা আশ্রমে যেখানেই জীবনসত্যের কোন নতুন রূপ কথিত বা ব্যাখ্যাত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তার প্রতিধ্বনি এসে পৌঁছেছে এদেশের মাটির মানুষদেরও কুড়ে ঘরে। হয়ত ঠিক অভিন্ন রূপে নয়, তবু অভিন্ন সত্ত্বায়। কিন্তু তাঁর শত মহাত্মা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের জীবন বাণীর কোন প্রতিধ্বনিই নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে এসে পৌঁছুতে পারল না। এ দুর্ভাগ্য শুধু আমাদের কৃষিজীবি — শ্রমজীবি সমাজ, বা রবীন্দ্রনাথের নিজের নয়, সারা দেশের।

কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজেই কি রবীন্দ্র-বাণীর কোন লক্ষণীয় প্রভাব বিদ্যমান? স্বল্প-শিক্ষিত বা মধ্যশিক্ষিত যে বিরাট অংশ মধ্যবিত্তসমাজের গরিষ্ঠভাগ, তাদের কথাই ধরা যাক।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরা স্বাজাত্যাভিমানে যতখানি গর্ব্বিত, তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে কি এদের ততখানি পরিচয় আছে? রবীন্দ্র বাণী উপলব্ধি তো দূরের কথা, রবীন্দ্র সাহিত্যের বিপুল বিস্তারের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় পর্যন্ত এদের অধিকাংশের নেই। রবীন্দ্রনাথ আর যাই হোন, আমাদের দেশে "জনপ্রিয় সাহিত্যিক" নন।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীব মহলেও কি রবীন্দ্র প্রতিভার স্বাক্ষর আজ জীবন্ত? নিঃসন্দেহে পোষাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণ, বাক্-ভঙ্গী এবং গৃহসজ্জায় কিছু পরিমাণে রবীন্দ্র প্রভাব এতরে সক্রিয়। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট?

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ সত্য নিঃসন্দেহে প্রতিভাত হবে যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচয় সত্ত্বেও, তাঁর সবচেয়ে বড় অবমাননা যদি কোথাও হয়ে থাকে, তবে তা' আমাদের বুদ্ধিজীবি মানসে। রবীন্দ্রনাথের উদার মানবতাবাদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনবোধের সার্থক সমন্বয়, চিন্তা ও আচরণে সামঞ্জস্য, তাঁর বহুব্যাপ্ত সামগ্রিক জীবনবোধ — যা বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় আত্মীয়তার উপলব্ধির ওপরে সুপ্রতিষ্ঠিত, —এ সবের কোন কিছুই সমকালীন বুদ্ধিজীবি মূল্যবোধে প্রতিফলিত হয় নি। অন্যপক্ষে উন্মাসিকতা, পরশ্রীকাতর সঙ্কীর্ণতা, বক্তব্য ও কর্মে অসং পার্থক্য, এবং সামঞ্জস্যহীন খন্ড দৃষ্টিভঙ্গীই একালের বুদ্ধিজীবি সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবনাদর্শের যে সামগ্রিকতা শান্তিনিকেতন — শ্রীনিকেতন মিলিয়ে বিশ্বভারতীর পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় বিধৃত, তাঁর অনুগামীরাও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হন নি। শ্রীনিকেতনকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে লালফিতের গাঁটছড়ায় বেঁধে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। শান্তিনিকেতনেও বিশ্বভারতীর আগের তুলনায় শহুরে চাকচিক্য এতই সুস্পষ্ট যে তার বেদনাদায়ক বর্ণনার পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথ আর যাই চান, তাঁর ধ্যানের সৃষ্টিকে বালিগঞ্জ — বড়-বাজারের কিম্ভূত সংমিশ্রণ করতে নিশ্চয়ই চান্ নি। কিন্তু বিশ্বভারতীর মধ্যে সে প্রবণতা যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সুধীজন তা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করেছেন।

অন্ততঃ যে একটি বিষয়ে রবীন্দ্রপ্রভাবের সার্থক প্রতিফলন বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবির জীবনে ঘটেছে বলে ভাবতে পারতুম, সাম্প্রতিক ঘটনা পরম্পরা সে বিশ্বাসের ভিত্তিতেও গভীর ফাটল ধরিয়েছে। দীর্ঘদিনের দাসত্বজনিত হীনমন্যতার ফলে বিদেশ সম্বন্ধে আমাদের মনে একসময় দুই পরস্পর বিরোধী ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল : একদিকে দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বিদেশী সভ্যতার শক্তি ও চাকচিক্য আমাদের আহত মনকে আত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা অভিযানের গর্ব্বভরে আশ্রয় নিতে প্ররোচিত করেছিল; অন্যপক্ষে সেই অভিভূত হীনমন্যতাই বিদেশের অন্ধ অনুকরণকে ধ্রুবসত্য বলে জেনেছিল। রবীন্দ্রযুগের প্রথম পর্ব্বে এ বিরোধ রীতিমত সক্রিয়। রবীন্দ্রনাথই আমাদের এই দুই আত্মঘাতী মনোবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করলেন। দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে সুবিস্তীর্ণ শস্যশ্যামলা ভূভাগের অবস্থিতি সম্বন্ধে তিনিই আমাদের সজাগ করে তুলেছিলেন। আমাদের স্থান, জীবনধারাকে সচল করবার জন্য পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ থেকে আমাদের যে প্রচুর গ্রহণীয় রয়েছে, সে কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য-সভ্যতার অমানবিক যান্ত্রিকতা এবং মানুষের সামান্যীকরণ প্রবণতা সম্বন্ধেও তিনিই আমাদের সচেতন করলেন। তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, বিশেষ করে তাঁর নাটকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থহীন যান্ত্রিকতা ও লালসালোল কুশ্রীতা মানুষের মনুষ্যত্বকে যে কিভাবে পীড়িত করছে তার জীবন্ত প্রতিফলন আমরা দেখতে পেলাম। প্রায় সমসাময়িক কালে-ই আমাদের জাতীয় আন্দোলনে নতুন গতিবেগের সঞ্চার ও মহাত্মাজীর

প্রভাবে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের বৃদ্ধিও আজ পাশ্চাত্যানুগামীতার স্রোতকে প্রতিহত করতে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রাথমিক বিচারহীন পাশ্চাত্য-বিমুখতার স্রোত কালক্রমে (কিছু পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেও বটে) যখন কল্যাণধর্মী আত্মস্থতার দিকে মোড় ঘুরল, তখন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী দৃষ্টিভঙ্গীর শক্তি আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এরই ফলে তার জীবনের শেষভাগ, এবং তাঁর তিরোভাবের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত প্রাচ্য পাশ্চাত্য জীবনধারার সংঘাত অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মানসিকতাকে পীড়িত করে নি। সহজ সমন্বয়ের যে উৎস রবীন্দ্রযুগে নির্ঝরিত হয়েছিল, তা অব্যাহত-স্রোতে বহমান থাকবে বলেই একসময় অনেকে ভাবতে পেরেছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম আনন্দোচ্ছ্বাস যখন কেটে গেল, তখন দেখতে পেলাম যে এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রপ্রভাবের পরিমাপে ভুল হয়েছিল। পাশ্চাত্য জীবননাদর্শের মঙ্গলময় মূল্য-গুলি আজও আমাদের জীবনে সুগ্রথিত নয়; কিন্তু পাশ্চাত্যের চোখ ধাঁধান বিভ্রান্তি আমাদের জীবনকে আজ বোধহয় আগের থেকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সৌভাগ্যক্রমে স্বাধীনতার পর আজ পাশ্চাত্যবিমুখতার শক্তি আজ বহুলাংশে পর্যুদস্ত। কিন্তু অনাপক্ষে নির্বিচার পাশ্চাত্যানুগামীতার স্রোত আজ নতুনশক্তিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই নবাগত বিপদের আবির্ভাব আজ আরও বেশি বিস্ময়ের ঠিক এই কারণেই যে পাশ্চাত্যসভ্যতার যে অন্তর্নিহিত গলদগুলি রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মনে ধরা পড়েছিল, সর্বাধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণাও পাশ্চাত্যসভ্যতার সেই ব্যর্থতার দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করছে। ম্যানহিম, বা এরিক ফ্রমের লেখায় আধুনিক সভ্যতার সঙ্কটের যে নিপুণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তা আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের রবীন্দ্রসাহিত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য যন্ত্র সভ্যতার ফলে ব্যক্তিমানুষের যে সত্ত্বাবিচ্যুতি (alienation) পরমাণুভবন atomization), সামান্যীকরণ বা বৈশিষ্ট্যবিলোপ সম্বন্ধে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী চিন্তিত, ক্ষমতালিপ্সার যে বীভৎস রূপ তাঁদের সচকিত করে তুলেছে সেগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কত সজাগ ছিলেন, তাঁর মনস্ক পাঠকমাত্রেই তা' জানেন। পাশ্চাত্যসভ্যতার স্বর্ণসৌধের আকাশস্পর্শী উচ্চতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে সে সৌধবাসীদের আপাতদৃষ্ট সমৃদ্ধির আড়ালে যে অপরিসীম অতৃপ্তি লুকিয়ে রয়েছে তা' তুলনাহীন। এরিক ফ্রমও তাঁর Sane Societyতে মনোবিকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষের আহার, বিশ্রাম, মৈথুন ইত্যাদি জৈবিক তাগিদগুলি সম্পূর্ণ মেটালেও সে তৃপ্ত হতে পারে না। অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপের প্রাগ্রসর দেশগুলির নরহত্যা, আত্মহত্যা ও মাদকাসক্তির সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেছেন যে জৈবিক তাগিদ পূরণে লক্ষ্যণীয় সাফল্য সত্ত্বেও ওসব দেশের মানুষ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজের মানুষের তুলনায় অনেক বেশী অসুখী। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করেছেন, অন্ততঃ তাঁদের গ্রন্থপঞ্জীতে এ স্বীকৃতি নেই। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী গবেষণা করে পাশ্চাত্য জীবনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের সাদৃশ্য তাঁর ধ্যান-দৃষ্টির স্বচ্ছতাই প্রমাণ করে। অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে একাধারে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের অধিকার এবং আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি আমাদের আয়ত্ত হলেও, এখনও পাশ্চাত্যের অন্ধ-মোহ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এখনও যে কোন লোকের মূল্য আমরা যাচাই করি পশ্চিমের দরবারে তাঁর স্বীকৃতি দিয়ে; স্বীয় কর্মক্ষেত্রে কারো শোচনীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁর নামে আমরা যে কারণে জয়ধ্বনি দেবার অভিলাষ তারস্বরে ঘোষণা করি তা' হচ্ছে, 'তিনি

বিদেশে আমাদের মান রেখেছেন'। বিদেশী ডিগ্রীর আভিজাত্যে আমাদের নিঃসংশয় আস্থা মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। মাতৃভাষা সম্বন্ধে আমাদের অনাস্থা এখনও সরব। ইংরেজী ভাষায় বা আচরণ-বিধিতে ব্যুৎপত্তি এখনও আমাদের সম্ভ্রম উদ্রেকের প্রধান মাপকাঠি। আর এই আচরণবিধি ও ভাষাজ্ঞান নিখুঁৎ করার উন্মত্ততায় খাঁটি ইংরেজের অভাবে ফিরিঙ্গী পাঠশালার পচনশীল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সমাজ আজ বদ্ধপরিকর।

সর্বভারতীয় স্তরেও অবশ্য সেই একই উন্মত্ততার রেশ। বিদেশী শোষণের বশম্বদ শাসনযন্ত্রকে অবিকৃত রেখেই আমাদের স্বাধীন কর্তৃপক্ষ দেশগঠনের স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। বেয়নেট দিয়ে চাষ করা যে সম্ভব নয়, একথা তাঁদের কে বোঝাবে? নয়াদিল্লীর পাশ্চাত্যানুকরণ ব্রিটিশ আমলকেও হার মানিয়েছে। গান্ধিজী তাঁর শিষ্যদের মাঝে রাজধানীতেই নিহত হয়েছেন—কিন্তু রবীন্দ্র-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীরাই বা নয়াদিল্লীর তুলনায় কোথায় স্বকীয়তা দেখাল?

সুব্রতেশ ঘোষ

বালুচর শাড়ি প্রদর্শনী

গত তেইশে ফেব্রুয়ারী থেকে চৌরঙ্গী ও হ্যারিংটন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে যে বালুচর শাড়ি প্রদর্শনী চলেছে, সম্প্রতি তা সমাপ্ত হল। সাম্প্রতিক প্রদর্শনীসমূহের মধ্যে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষনীয় প্রদর্শনীরূপে পরিগণ্য হবার যোগ্য। স্বনামধন্য শিল্পী সুভো ঠাকুরের ঈর্ষাযোগ্য পুরাবস্তু-সংগ্রহ-ভুক্ত প্রায় দেড় শ' শাড়ির মধ্যে মাত্র ৫৬টি শাড়ি নিয়ে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার প্রাচীন বয়নশিল্পের একটি আশ্চর্য নিদর্শন দেখার সুযোগ দানের জন্য সুভো ঠাকুর শিল্পরসিক মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

বয়নশিল্পের দুটি নিরুপম নিদর্শনের জন্য দেশে ও বিদেশে বাংলার খুব খাতির ছিল, বালুচর শাড়ি তাদের অন্যতম। অপর নিদর্শনটি, বলাই বাহুল্য, ঢাকার মসলিন।

মুর্শিদাবাদের বালুচর (জিয়াগঞ্জকে এখনও বালুচর বলা হয়) গ্রাম থেকে বালুচর বুটিদার বা বালুচর শাড়ির নামের উৎপত্তি। বালুচর থেকে উক্ত নামকরণ হলেও আসলে বালুচরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতেই বালুচর শাড়ি তৈরি হত। এই সব গ্রামের মধ্যে বাহাদুরপুর, মীরপুর (বর্তমানে গঙ্গাগর্ভে) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বালুচর বুটিদারের শেষ কীর্তিমান শিল্পী দুবরাজ দাস জাতে চামার; ১৮৮৯ সালে তাঁর বয়স ছিল ৮০, মীরপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর তৈরি কোন কোন বালুচর শাড়ি বা রুমাল, স্কার্ফ ইত্যাদির প্রান্তভাগে 'দুবরাজ দাস' বা 'দুবরাজ দাস, মীরপুর' কথা কয়টি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয় এবং মুর্শিদাবাদে তখন এক ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। সম্ভবত এই সময় ঢাকা (বয়নশিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র, মসলিন ও জামদানী শাড়ির জন্মস্থান) থেকে কিছু সংখ্যক মুর্শিদাবাদে চলে আসে এবং নবাব, আমীর-ওমরাহ, হিন্দু জমিদার ও জৈন বণিক প্রভৃতি বড়লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রেশম-সুতোয় (মুর্শিদাবাদে রেশম সুলভ ও প্রচুর বলে) নতুন এক ধরনের শাড়ি তৈরি করতে শুরু করে। সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য এই শাড়ি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ও বালুচর শাড়ি নামে বিখ্যাত হয়। ঠিক ১৭০৪-এর কিছু পরেই যে এ শাড়ি তৈরি হতে শুরু করেছিল, তা হয়তো নয়। স্থানীয় শিল্পীরা তার দশ-বিশ বছর আগেই হয়তো এই জাতীয় কাপড় বানাতে শুরু করেছিল, ঢাকার তাঁতিরা এসে তাকে নবজীবন দান করেছিল, এমন ভাবাটা হয়তো অসঙ্গত নয়।

বালুচর শাড়ি খাম-রেশমে reeled silk তৈরি এবং হালকা লাল কৃষ্ণলোহিত বা চকোলেট, নীল, বেগুনি, কমলা প্রভৃতি প্রায় চোদ্দ-পনেরো রকমের রঙে দেখা যায়। এই সব রং সাধারণত নীল বা ইণ্ডিগো, লাক্ষা, হরিতকী, আমলকী, বহেরা, শিউলি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ থেকে আহৃত হত। দৈর্ঘে দশ হাত এবং প্রস্থে বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চির বালুচর শাড়ি সবচেয়ে উল্লেখ্য ও আকর্ষনীয় অংশ হল আঁচল বা প্রান্তভাগ। শিল্পী তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করতেন আঁচলটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে।

বালুচর শাড়ির আঁচলের প্রতিকৃতি ইত্যাদি বিষয়ক অলংকরণ বিশেষ আকর্ষনীয় ও অভিনব। অঙ্কিত নর-নারীর প্রতিকৃতি দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ ভারতীয় ও য়ুরোপীয়। ভারতীয় নর-নারীরা মুসলমান বলেই মনে হয়। এই সব ভারতীয় নর-নারীর মধ্যে কিছু সংখ্যক হুঁকা বা ধূমপানরতা মহিলাও আছেন; অন্য নর-নারীদের মধ্যে কারও কারও হাতে ফুল রয়েছে। টুপি ও বনেট পরিহিত য়ুরোপীয় পুরুষ ও রমণীদের হাতেও ফুল দেওয়া হয়েছে, কখনও বা পানপাত্র। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে স্টীম ইঞ্জিন, ইঞ্জিনযুক্ত রথ, স্টীমার (এই বাহনগুলির আরোহীগণ কিন্তু য়ুরোপীয়। এগুলি কি ইংরেজদের দৌলতে ভারতবর্ষে সদ্য-আগত রেল-ইঞ্জিন বা স্টীমারের পরিসূচক নয়?) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের সমকালীন বিষয়সমূহকে শাড়ির অলংকরণ হিসাবে ব্যবহার করে বালুচর শাড়ির শিল্পরা তাঁদের সমাজ ও যুগচেতন প্রগতিশীল মানসতার পরিচয় দিয়েছেন।

ভালো জাতের বালুচর শাড়ি পাকোয়ান সুতোর তৈরি এবং দীর্ঘস্থায়ী। একটি ভালো শাড়ি তৈরি করতে তিন চার মাস পর্যন্ত সময় লাগত এবং দাম পড়ত দশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে। অপেক্ষাকৃত খারাপ জাতের শাড়ি সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বোনা হত এবং দাম পড়ত আট থেকে চল্লিশ টাকার মধ্যে। সাধারণ ও অপেক্ষাকৃত শাড়ির টানার সুতোর সংখ্যা কম হত এবং পড়েনের বুননিও ভালো হত না; রঙ-ও প্রায়শঃই পাকা হত না। বালুচর শাড়ির শিল্পীরা শাড়ি ছাড়া রুমাল, স্কার্ফ শাল ইত্যাদিও তৈরি করতেন। দুবরাজ দাসের নামাঙ্কিত রুমাল ও বড় শালের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

বালুচর শাড়ি হিন্দু মেয়েরাই পরতেন এবং বিবাহোৎসব ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁরা এ শাড়ি পরতেন। নবাবদের হারামের মেয়েরা ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান মেয়েরা এ শাড়ি পরতেন না কারণ তাঁদের পরিধেয় ছিল ঘাগরা বা পেশোয়াজ। কিন্তু বালুচর শাড়ি মূলত নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই তৈরি হয়েছিল এবং নবাবরা শিল্পদ্রব্য হিসাবেই বালুচর শাড়ির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নবাবদের পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরাও সম্ভবত বালুচর শাড়ির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এবংবিধ ধরণার কারণ এই, নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহায্য ও সমর্থন ব্যতিরেকে বালুচর শাড়ির মত ব্যয়সাপেক্ষ শিল্পনিদর্শন সম্ভব ছিল না। হিন্দু জমিদার ও শেঠজি শ্রেণীর জৈন ধনিক সম্প্রদায় এর প্রধান ক্রেতা ছিলেন, এবং বলা বাহুল্য, পুরোনো বালুচর শাড়ির অধিকাংশই জমিদার ও প্রাচীন জৈন বড়লোকদের বাড়ি থেকেই পাওয়া গেছে। এখানে উল্লেখ্য যে বালুচর শাড়ির আদি ও প্রধান তাঁতিরা ছিলেন মুসলমান। দরবার ও বড়লোক সম্প্রদায়ের দিন ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বালুচর শাড়িও তখন গমিতমহিমা হয়ে পড়ল। য়ুরোপে জাপানী ও চীনা রেশমের ব্যাপক প্রসার, ইতালীয় রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে বাংলার রেশমের উৎকর্ষ হ্রাস, বিদেশী রেশমের আমদানী ও উনিশ শতকের শেষ দিকে কিছুদিনব্যাপী গুটিপোকার মড়ক প্রভৃতি কারণের সমবায়ে বাংলার রেশমশিল্পের অপেক্ষাকৃত সার্বিক অবনতি ও সর্বোপরি, লোকরুচির পরিবর্তনের ফলে বালুচর শাড়ি শীতকালের সূর্যের মত অস্তগমন করে।

কল্যাণকুমার দাসগুপ্ত

স মা লো চ না

গীতিগুঞ্জ ।। অতুলপ্রসাদ সেন। দাম পাঁচ টাকা।

বাংলা সঙ্গীতের সমৃদ্ধ ইতিহাসে কবি ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু' দশক থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাস নবসৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরকে তার ঐশ্বর্যের যুগ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্ততঃ চারজন গীতিকার নানাদিক থেকে বাংলা গানের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। এই চারজন হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুল। গীতিকার ও সুরকার হিসেবে অতুলপ্রসাদ এক মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌ প্রবাসী। লক্ষ্ণৌ ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির পীঠস্থান। অতুলপ্রসাদের স্বভাবসিদ্ধ সাঙ্গীতিক প্রতিভা লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতির বিশিষ্ট ধারায় পরিশীলিত হয়েছিল। বাংলাগানের মধ্যে লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর বিশিষ্ট ঢঙ ও মেজাজ তিনি অবলীলাক্রমে সঞ্চারিত করেছিলেন। ঠুংরীগানের রাগমিশ্রণ তাঁর গানেও আছে, কিন্তু কোথায়ও তা উগ্রতায় স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে ওঠে নি— তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এখানে।

'গীতিগুঞ্জ' অতুলপ্রসাদের গানগুলির একটি সুবিন্যস্ত সঙ্কলন। বিষয়ানুসারে কবিতা-গুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে— 'দেবতা,' 'প্রকৃতি,' 'স্বদেশ', 'মানব' ও 'বিবিধ'। এ পাঁচটি বিভাগ ছাড়াও 'পরিশিষ্ট' অংশে কয়েকটি অপ্রকাশিত গান সংযোজিত হয়েছে। আলোচ্য সংস্করণে অতুলপ্রসাদের সাঙ্গীতিক প্রতিভা ও কবি-মানসটিকে সযত্ন-বিন্যাসের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাগানের কাব্য-সঙ্গীতের ঐতিহ্য গৌরবান্বিত। কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যে গীতিকবি ও গীতিকারের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং গীতিকবিতা হিসেবেও অতুলপ্রসাদের এই গানগুলির মূল্য নির্ণিত হতে পারে। 'দেবতা' পর্যায়ের কবিতা-গুলিতে যেখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে বেদনা-বিধুর বৈরাগ্য ও আত্মগ্লানির প্রকাশ করেছেন সেখানে তার স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যানুভূতি অনেকখানি ক্লিষ্ট হয়েছে। কিন্তু যেখানে এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা প্রকৃতি ও প্রেমের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়েছে সেখানেই তাঁর এই শ্রেণীর কবিতা সার্থকতর। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে কবি চিরসুন্দরের স্পর্শ অনুভব করেছেন — শব্দধ্বনিতে ও অর্থগৌরবে এক একটি ছবি অপরূপ ঃ

কভু পুষ্পিত নভ-কুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে;
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন শ্যাম-
মূরতি অতি সুন্দর!

অতুলপ্রসাদের প্রকৃতি সম্পর্কিত কবিতার বৈচিত্র্য খুব বেশী নয়, কিন্তু প্রকৃতির ভেতর দিয়ে এক আত্মময় ভাবুকতা কবিতাগুলিকে এক ভাব-সংহত নিটোল লাবণ্য সঞ্চারিত করেছে।

প্রকৃতি-চেতনায় প্রধানত তিনি তাঁর মনের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসরস পরিবেশন করেছেন। প্রকৃতির ভেতর দিয়ে তিনি অনেকগুলি কবিতায় বৈষ্ণবীয় লীলানুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতির কবিতায় উল্লাস ও লীলারসের অন্তরালে মাঝে মাঝে এক একটি অশ্রুবিন্দু ও দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় — কবি তাঁর হৃদয়াংশ যুক্ত করে কবিতাকে এক নূতন তাৎপর্যমণ্ডিত করেন ঃ

আকাশ, বলরে আমায় বল, আমার আঁখির জল
তাদের মতো জীবনখানি করবে কি শ্যামল—আমায় বল্‌রে।
আমি তাদের মতো আমার বঁধুর সনে মধুর খেলা
খেলব কি দিনের শেষে?
ও আকাশ, বল্ আমারে।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে অতুলপ্রসাদের তেরখানি স্বদেশপ্রেমের গান সংকলিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে বাঙালীর ভাব-জীবনের মধ্যে এক তুমুল আলোড়ন সঞ্চারিত হ'য়েছিল। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতো সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বাংলাসাহিত্যের গীতিকারেরা জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত রচনায় অজস্রতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। অতুলপ্রসাদের এই পর্যায়ের কয়েকটি গান বিষয়গৌরবে ও ভাবানুভূতিতে 'ক্লাসিক' পর্যায়ে উঠেছে। অতীত ভারতের গৌরবস্মৃতি ও বর্তমানকালের দুঃখ-দুর্গতিকে যেমন তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি শুনিয়েছেন এক মুক্ত জাগ্রত জীবনের গান।

কবিতা হিসেবে প্রকৃতি ও প্রেমের কবিতাই সবচেয়ে বেশী রসোত্তীর্ণ হ'য়েছে। এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে অতুলপ্রসাদের কবিতার গীতিধর্ম নিঃসংশয়িত হ'য়ে উঠেছে। প্রবল হৃদয়বেগ ও উন্মাদনার তীব্রতা অতুলপ্রসাদের প্রেম কবিতায় অনুপস্থিত — একটি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল রূপোল্লাস তাঁর কবিতায় সুগন্ধী ধূপের মতো ছড়িয়ে আছে। মেঘ-মন্থর নিশীথে হৃদয়-রাধিকার স্বপ্নাটি অলস-ললিত ছন্দের মৃদু-মূর্ছনায় এক অপূর্ব-সুন্দর রূপ-সৃষ্টি করেছে ঃ

ঘন মেঘে ঢাকা সুহাসিনী রাকা
তুমি কি গো সেই মানিনী?
বাদল-নিঝরে শুধু মনে পড়ে
সে দুটি কাজল করুনী।

'কে আবার বাজায় বাঁশি' অথবা 'ওগো আমার নবীন শাখী' জাতীয় গান, শুধু গান, হিসেবেই নয়, কবিতা হিসেবেও অতুলপ্রসাদের শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দেয়। বৈষ্ণব কবিতার ক্ষণ-ব্যঞ্জনায় প্রথমোক্ত কবিতার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাকে রঞ্জিত ক'রে তোলা হ'য়েছে — চিরন্তনী রাধিকার আকুল পিপাসায় কবিতাটি অতুলপ্রসাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তিতে পরিণত হ'য়েছে ঃ

কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে
হৃদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণনে।
কোয়েলা উকল আবার, যমুনায় লাগল জোয়ার;
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর দুই নয়নে?

অতুলপ্রসাদের গানের কাব্যাংশ সম্পর্কে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য ক'রেছেন। ভাষা, ছন্দ ও কাব্যাংশের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে। অবশ্য কাব্য-সঙ্গীত বিচারে কাব্যেরও

একটি বড় স্থান আছে। সেখানে সযত্নভাষা-বিন্যাস ও ছন্দের সৌকুমার্য যে শব্দার্থ-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে তাকে অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম ঐশ্বর্য এর কাব্যাংশের রমণীয়তা। ভাষার নিপুণ বিন্যাস ও ছন্দের নিটোল সুষমা রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্যাংশকেও সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। সুর বাদ দিলেও শব্দার্থময় কথা-শরীরেরও একটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে। সুতরাং সঙ্গীত ছাড়া এর কাব্যমূল্যকেও অস্বীকার করা যায় না। অতুলপ্রসাদের গান সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না। 'গীতগুঞ্জে'র কবিতাগুলি মুখ্যত গান গৌণত কবিতা। এই কারণেই বিশুদ্ধ কাব্য-সমালোচকের দৃষ্টিতে কবিতা হিসেবে এর কিছু কিছু আঙ্গিকগত অসঙ্গতি চোখে পড়বে, কিন্তু সুর-সংযোগে এই অসঙ্গতিগুলি এক একটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত রূপ পরিগ্রহ করে।

কবি অতুলপ্রসাদের চেয়ে গীতিকার অতুলপ্রসাদ অনেক বড়। এই সত্যটি মেনে নিলেও অতুলপ্রসাদের কবি-প্রতিভাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাঁর কোনো কোনো কবিতার ছন্দ-লালিত্য, শব্দ-চাতুর্য ও চিত্রকল্প অপরূপ। উপমা ও চিত্রকল্পের অভিনবত্বের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

ও দুটি নয়ন-মণি চিনি যে গো আমি চিনি,
কাজল মধুপ-ছায়া দেখেছি ফুল-শিশিরে।

'কাজল মধুপ-ছায়া' ও 'ফুল-শিশির' নয়ন-মণিকে অপূর্ব অর্থ দ্যোতনায় ব্যঞ্জিত ক'রেছে। কবিমনের লাবণ্যময় অনুভব এক রূপমুগ্ধ ও স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম-সংবেদনে চিত্রিত হ'য়েছে। এই জাতীয় সার্থক কাব্যশ্রী অতুলপ্রসাদের কোনো কোনো কবিতায় প্রথম শ্রেণীর কবিস্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা ক'রেছে।

কবি ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ আজ বিস্মৃত প্রায়। বিশেষ অনুষ্ঠানে কালে-ভদ্রে অতুলপ্রসাদের গান শোনা যায়। নিঃসন্দেহে বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতির ইতিহাসে এটি শুভ লক্ষণ নয়। অথচ এক সময় অতুলপ্রসাদের গান জনসাধারণকে আনন্দ দিয়েছিল ও বিদগ্ধজনের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ ক'রেছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই শ্রদ্ধাবান কবি-কনিষ্ঠকে উচ্ছ্বসিত সমাদর জানিয়েছেন। অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত-সঙ্কলনটিকে প্রকাশ করে প্রকাশক নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ হবেন। অতুলপ্রসাদের উদ্দেশ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা, অতুলপ্রসাদের প্রতিকৃতি ও হস্তাক্ষর সংযোজিত হয়ে আলোচ্য সঙ্কলনটির গৌরব বৃদ্ধি ক'রেছে।

রথীন্দ্রনাথ রায়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

EARLY WORKS মূল্য ১৩'০০, বোর্ড ১৫'০০

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত 'অভিসারিকা', 'বুদ্ধ ও সুজাতা' 'ওমর খৈয়াম' ঋতুসংহার' প্রভৃতি তেরোখানি চিত্রের রঙিন প্রতিলিপি। শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ ও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিত আলোচনা সহ।

ভারতশিল্পে মূর্তি মূল্য ০'৫০

"ভারতীয় শিল্পের মূর্তিগঠনের মূল তত্ত্ব ও সৌন্দর্য বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক।"—যুগান্তর

ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ মূল্য ০'৫০

"শিল্পীর প্রকাশ-বেদনা বা উদয়-বাসনা ছন্দে সংবদ্ধ হইয়া রসের সাহায্যে কিরূপে আত্মা হইতে চিত্রের এবং চিত্র হইতে আত্মান্তরে সঞ্চারিত হয়, তাহার অনুপম ব্যাখ্যা।" —প্রবাসী

সহজ চিত্রশিক্ষা মূল্য ১'০০, বোর্ড ২'০০

"অবনীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকাঠি দিয়ে শিশুর মনের ঘুমন্ত শিল্পীকে জাগিয়ে তোলার বন্দোবস্ত করেছেন।" , —চতুরঙ্গ

বাংলার ব্রত মূল্য ০'৫০

"বর্তমান গ্রন্থে শিল্পী ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাংলার ব্রতগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

গল্প

মাসি মূল্য ২'৫০

মাসি, বনলতা ও হাতেখাড়ি গল্প তিনটি ছোটদের উপযোগী হলেও বড়দের কাছেও এর আদর কম নয়। কুটুম-কাটুমের কর্মরত কারিগর অবনীন্দ্রনাথের একখানি আলোকচিত্র সম্বলিত। "ছবি লেখাই এ সব লেখার সঠিক বর্ণনা।" —দেশ

পথে বিপথে মূল্য ২'৫০

"গদ্য কতটা কাব্যধর্মী হতে পারে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।" —চতুরঙ্গ

আলোর ফুলকি মূল্য ২'৫০

"অবাক হয়ে গেছি এ বই পড়ে। ভাবতে পারিনি এ রকম বই বাংলা ভাষায় সম্ভব।" —কবিতা

স্মৃতিকথা

ঘরোয়া মূল্য ২'৫০

"ঠাকুর-পরিবারের, ও তাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন অভিজাত ও মধ্যবিত্ত বাংলা দেশের যে রূপ ঘরোয়ায় ফুটে উঠেছে তা ইতিহাসের পাতায় কিংবা অন্য কোনো বইএ পাওয়া যাবে না,, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'য় ছাড়া।" —চতুরঙ্গ

জোড়াসাঁকোর ধারে মূল্য ৩'৫০

"এ বইয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর শিল্পীজীবনের ক্রমবিকাশের কথা। অবনীন্দ্রনাথ শুধু রেখারঙের শিল্পী নন, ভাষাশিল্পীও; বাংলা গদ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট আসনের অনুপেক্ষণীয় দাবি নিয়ে এসেছে—জোড়াসাঁকোর ধারে।" —কবিতা

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে ২৩ বৈশাখ-৬ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত উপরোক্ত পুস্তক ও বিশ্বভারতীর অন্যান্য গ্রন্থ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।. কলিকাতা ৭